ললিতকলা ও জনমানস

অনুবাদক ঃ
ডাঃ সুধীরকুমার নন্দী

সাহিত্যায়ন
৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৭১

প্রকাশক :
মালবিকা দত্ত
সাহিত্যায়ন
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রণ :
শ্রীপশুপতি কর্মকার
শ্রীমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮৩বি, গ্রে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ অলংকরণ
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

সূচীপত্র

ললিতকলা
ও
জনমানস

। ১ ।

শিল্প ও মানব-অভিজ্ঞতা

জীবনের সত্যরূপটুকু যা-ই হোক্ না কেন, এ কথা বলা চলে যে জীবন বলতে সাধারণতঃ আমরা মানুষের অভিজ্ঞতাকে বুঝি। আবার এই অভিজ্ঞতার স্বরূপ যেমনই হোক্ না কেন, এ তত্ত্ব অসংশয়িত সত্য যে অভিজ্ঞতা হল কালাশ্রয়ী প্রবাহ মাত্র। অনন্তের বুকে এক নানা রঙের কাহিনী। মানব অভিজ্ঞতা দ্বিবিধ—সরল ও জটিল। শিশুর অভিজ্ঞতা, প্রাকৃত জনের অভিজ্ঞতায় সারল্যের দ্যোতনা; বিষয়ী মানুষের, কবি ও বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতায় অনন্ত জটিলতা। শিশুর অকারণ পুলকে উদ্দেশ্যবিহীন অঙ্গসঞ্চালন, তার ইতস্ততঃ দৃষ্টিবিক্ষেপ হল এই সরল অভিজ্ঞতার নিদর্শন। লক্ষ্যসন্ধানী গোলন্দাজদের সংহত দৃষ্টি ও সংযত দেহচালনা হচ্ছে জটিল অভিজ্ঞতার উদাহরণ। বস্তুর নিরীক্ষা ও পরীক্ষা থেকে শুরু করে আবিষ্কারের স্পৃহা ও চিন্তার সঙ্ঘবদ্ধতা—বাস্তব ও কল্পনা—সবকিছুর মধ্যেই এই অভিজ্ঞতার প্রসার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যে বিস্তার সে বিস্তারে পঞ্চ ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনের অনন্ত বৈচিত্র্য; পরিবেশের নিরন্তর আহ্বান ও আমন্ত্রণ এসে পৌঁছুচ্ছে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে, মনের অন্দরমহলের সীমানায়। সে ডাকে সাড়া দেয় মানুষের ইন্দ্রিয় আর নিত্য চলমান মন। ব্যক্তিমানুষটি কর্ম-চঞ্চল হয়ে ওঠে; মনে মনে চিন্তার জট বাঁধা হয়। কাজই হোক্ আর চিন্তাই হোক্ তা একদিকে যেমন অকারণ পুলকজাত হয় অন্যদিকে আবার তা উদ্দেশ্যসঞ্জাতও হতে পারে। অনেকেই আবার একে অভিজ্ঞতার অন্তরালবর্তী বা অভিজ্ঞতা থেকে সুদূর কোন অনুভূতির বিকাশ বা বিভ্রম বলে গণ্য করেছেন। কখন বা আবার এই সত্তার প্রকাশ ঘটে; সন্ধানী

মন সন্ধান পায় এই মহা-সত্তার অভিজ্ঞতার চকিত আলোকে। আবার কেউ কেউ এই অভিজ্ঞতাকে বিভ্রান্তিকর বলেছেন; অভিজ্ঞতা হল মায়ামাত্র। একে স্বপ্ন, একে মায়া, একে মতিভ্রম বলা হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রী এবং কবিরা এমনিধারা অসংখ্য আখ্যায় মানব-অভিজ্ঞতাকে অভিহিত করেছেন।

মানুষের অভিজ্ঞতাকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এর সত্যটুকু অনস্বীকার্য; একে অস্বীকার করা যাবে না। অভিজ্ঞতাকে একাভিমুখী এবং কেন্দ্রীভূত করে এর তীব্রতাকে সহজেই বাড়ানো যায়; আবার বিপরীত পন্থায় এর স্বাভাবিক আবেদনকে খর্বও করা সম্ভব। মানব-অভিজ্ঞতা পাশবিক বিশৃঙ্খলতায় বিধৃত। অস্পষ্ট এবং শতধাবিভক্ত; আবার কখন তা সুশৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণ। তার বিস্তৃতি, তার গভীরতা, তার ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা শিল্পের ক্ষেত্রে সম্যক্ পূর্ণতা পায়। শিল্পের জগতে বুদ্ধি মানুষের পরিবেশকে রূপায়িত করে, চেনা জগত নতুন রূপ পায়। শিল্পীর চেতনায় নতুন রূপলোকের সৃষ্টি হয়। মহাদার্শনিক আরিস্ততল বলেছিলেন যে শিল্পে এবং রাজনীতিতে কোন ভেদ নেই; রাজনীতির মতই শিল্পেরও উপজীব্য হল মানুষের সবটুকু অভিজ্ঞতা; রাজনীতির মতই শিল্পেরও রঙ্গভূমি হল জীবনের সবটুকু বিস্তার।

শিল্পের এই সুবিস্তৃত সংজ্ঞার্থ রাজনীতিবিদের পথে একান্তরূপে গ্রাহ্য এবং একে সত্য করে তোলাই তার পরম সাধনা। মানুষের পারিপার্শ্বিকের রূপান্তর সাধনই হল এই জীবশিল্পায়নের মূল কথা। কিন্তু বাধা এই যে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিককে সম্যকরূপে জানি না। শিল্পীরাও একেবারে এর ব্যতিক্রম নন। যখন পরিবেশ সম্পর্কে ধারণাটুকু অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তখন রূপান্তর ঘটাবার প্রয়াসটুকু সাফল্যমণ্ডিত হবে কী না সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। তাই জীবন-শিল্পায়ন তথাকথিত শিল্পীর কাজ নয়। গ্যয়টে ও নিউটনের মত সৃজনশীল প্রতিভা এবং আলেকজান্দারের মত মহাবীরের সমন্বয় যদি ঘটানো যায় একটি মানুষের মধ্যে তবেই সেই মহাশিল্পী জীবন-শিল্পায়ন করতে পারবেন; তিনিই পারবেন তাঁর পারিপার্শ্বিকের রূপান্তর সাধন করতে। জীবন-শিল্পায়ন ইতিবৃত্ত বা ঘটনামাত্র নয়। তা হল সাধনা; তাকে ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় ভাস্বর করে তোলা যায়।

বস্তুতঃপক্ষে শিল্পী জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতাকেই তার শিল্পের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করে ; অবশ্য শিল্পে সমগ্র জীবনের ব্যঞ্জনাটুকু তার মধ্যে আভাসিত বা অনুস্যূত হওয়াও অসম্ভব নয়। মানুষের অভিজ্ঞতাকে যদি তার বুদ্ধির গ্রন্থনা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, যদি জীবন শিল্প থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়, তা হলে মানুষের সকল অভিজ্ঞতা খেয়ালী মননের অস্পষ্টতায় ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তার অর্থ থাকে না। কেননা জগত থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার কোন নির্দিষ্ট রূপ থাকে না, সে তার লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে। যে শব্দ সঙ্গীত হতে পারত তা কেবলমাত্র অনভিপ্রেত অস্পষ্ট অসংলগ্ন ধ্বনিবিকারে পর্যবসিত হয়। যে আকার, যে রং রূপময় হতে পারত, আনন্দ দিতে পারত রসিকজনকে তা নিরানন্দময় রূপহীন ব্যর্থতায় হয় রূপান্তরিত। যদি বাক্যে কর্মের ইঙ্গিত থাকে, নির্দেশ থাকে নির্দিষ্ট কর্মরূপকে ফুটিয়ে তোলার, তা হলে আংশিকভাবে জীবন তার আপন রূপটুকুকে ফিরে পায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার উপজীব্য হবে এই তত্ত্বকথা—মানব-সভ্যতারও একটি সুনির্দিষ্ট শিল্প-রূপ রয়েছে। এই রূপসাধনায় আকস্মিকতা থাকলেও তা এর শিল্পমূল্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে নি।

জীবন যেখানে আপনার রূপটুকু খুঁজে পায় সেখানে সে শিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠে। সভ্যতা যখন অসংগতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সুসংগত রূপ গ্রহণ করে তখনই তা হয় নন্দনতাত্ত্বিক মর্যাদায় ভাস্বর। যাকে আমরা প্রথা বলি, যাকে বলি আঙ্গিক, তা হল মানুষের বুদ্ধির সৃষ্টি। অভিজ্ঞতার বিষয় বস্তুর ওপর আমাদের মননশক্তির কর্তৃত্ব যখন সম্পূর্ণ বজায় থাকে, যখন সে কর্তৃত্বে শৈথিল্য আসে না, তখনই আমাদের অভিজ্ঞতা শিল্প-রূপ পায়। আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে আমরা যখন বল্গান্বিত করি তখন তার যে সুসংহত রূপটুকু পাই, সে রূপের শিল্পমূল্যও অনস্বীকার্য। যেখানে সংহতি সেখানে রূপ, সেখানেই শিল্পলোক। একটা লাঠিকে ভেঙ্গে দু'খণ্ড করা, মাটির একটি কুঁড়েঘর তৈরী করা, আকাশচুম্বী প্রাসাদ গড়া, মন্দির প্রতিষ্ঠা করা, এসব যেমন শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে ঠিক তেমনি আবার আমরা শিল্পমূল্যকে খুজে পাব ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময়-কর্মে, মাঠে বীজবোনার ও শস্য-কাটার কাজে, ছেলেমেয়েদের বিদ্যাদানকার্যে এবং দেশের ও দশের জন্য আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টায়। যারা খনিতে কয়লা কাটে, যে তাঁতি তাঁত

বোনে, এরা সকলেই শিল্পী বলে বিবেচিত হতে পারে। যাঁরা সুরকার অথবা যাঁরা ভাস্কর্যকর্মে দক্ষ তাঁদের চেয়ে ঐ মুটে-মজুর, ঐ পড়ুয়া-শিক্ষকের দল কম বড় শিল্পী নন।

কেবলমাত্র ললিতকলাকেই যে 'শিল্প' আখ্যা দেওয়া হয়, এটা একেবারেই আকস্মিক কারণবশতঃ। অঙ্কনশিল্পে ও ভাস্কর্যকর্মে, সঙ্গীতে ও কাব্যে, শিল্পবস্তুকে (content) এমন সুন্দরভাবে রূপ দেওয়া হয় যে শিল্পকর্মটি আনন্দের আকর হয়ে ওঠে। বুদ্ধির আলোয় শিল্পকর্ম নতুন অর্থে ও ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়; হয় সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী। তাই ত এই শিল্পকর্মে রসিক সুজনের জন্যে নন্দনতাত্ত্বিক রসাস্বাদন ঘটে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই নির্দিষ্ট শিল্পরূপ ব্যতীত অন্য শিল্প-রূপেও রসিকজনের আনন্দের আস্বাদন ঘটতে পারে; তবে একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্পকর্ম কেবলমাত্র তখনই আনন্দ দেয় যখন শিল্পবস্তুকে তার যথাযথ রূপটুকু দেওয়া হয়। যখন গতির একটা লক্ষ্য থাকে, জীবন যখন বুদ্ধি-আশ্রয়ী সংগতির মধ্যে বিধৃত হয়, যখন অসংগতির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও পাই শিল্পানন্দের আস্বাদন। যদি মানুষের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাইরে শিল্পকে নির্বাসিত করি, যদি বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার না দিই, তা হলে অবশ্যই মানব-অভিজ্ঞতা তার অর্থ ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে। তার মধ্যে কোন সংগতি ও শৃঙ্খলা থাকবে না। তার অন্তরে রূপ ও লক্ষ্যের অসদ্ভাব ঘটবে।

দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের মতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন হল কোলাহল-মুখরিত একটা বৃহৎ বিশৃঙ্খলার প্রকাশ মাত্র; চরম নিষ্ক্রিয়তায় কতখানি জীবন যে পঙ্গু হয়ে রয়েছে, সেটুকু বোঝার মত স্থৈর্য্যও আমাদের সকল সময়ে থাকে না। জীবনের অভিজ্ঞতাকে দিবাস্বপ্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও যে স্বচ্ছতা, যে পরিচ্ছন্নতা থাকে তার অভাব আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই। অবশ্য স্বপ্নের মধ্যে যে অসংলগ্নতা, যে অহেতুক শঙ্কার দেখা আমরা মধ্যে মধ্যে পাই, তার অনেকখানিই আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে খুঁজে পেতে পারি। একটা বিরাট আলস্যের বোঝা মনে হয় জীবনটাকে। আমাদের চোখ থাকতেও আমরা দেখতে পাই না, কান থাকতেও পাই না শুনতে। আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির দ্বারে হাজারো আবেদন অপেক্ষমান কিন্তু

আমরা দ্বার উন্মুক্ত করি না, ভুলেও সাড়া দিই না এই আহ্বানে। কখন কখন আমাদের মধ্যেকার পশুপ্রবৃত্তিগুলো সাড়া দিয়ে ওঠে পশুজীবনের আকস্মিক প্রচণ্ড কোন ক্ষুধার তাড়নায়। আমরা প্রায় সকলেই এই ধরনের আচ্ছন্ন-বুদ্ধি নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করি। সংগীতে যার অধিকার জন্মায়নি তার কাছে যেমন সংগীতের আবেদনটুকু দিবাস্বপ্নের মধ্যে পাওয়া স্নায়ুগত উত্তেজনা মাত্র, তেমনি আমাদের অধিকাংশের কাছেই জীবন হল, জীবনের অভিজ্ঞতা হল এই মগ্ন-চৈতন্যের মাঝে স্নায়বিক উত্তেজনার সাময়িক বুদ্বুদ।

এখন এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কেমন করে কোন্ পথে আমাদের এই অভিপ্রেত উদ্দীপনাজাত অনিয়ন্ত্রিত প্রত্যুত্তরটুকুকে শিল্পে রূপান্তরিত করা যেতে পারে? শিল্পী কেমন করে অভিজ্ঞতার অন্তরে শান্তির সঞ্চার করে, স্থিতি ও স্থৈর্যের অনুস্যুতি ঘটায়? কেমন করে সে তার অভিজ্ঞতাকে একই সময়ে অতি-চেনার আবরণমণ্ডিত করে বহুবিচিত্রতার আলোয় রাঙিয়ে তোলে? কী সেই শিল্পীর জাদু যা আমাদের মন টানে, অতি-পরিচিত জগতটাকে অতিবিচিত্র করে তোলে? আমরা রসসমুদ্রে অবগাহন করে, স্নান-পান করে ধন্য হই?

সাধারণ অভিজ্ঞতাটুকু যা আমরা আমাদের ব্যবহারগত জীবনে নিত্য পেয়ে থাকি, আমাদের প্রবৃত্তিগত প্রত্যুত্তরটুকু যে অভিজ্ঞতার একমাত্র উপজীব্য, সেই সর্বজনগম্য অভিজ্ঞতা হল নিষ্প্রাণ; তার মধ্যে শান্তভাবের একান্ত অভাব। আমাদের স্বভাব এবং প্রবৃত্তির দাস্যটুকু আমরা এমন নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিয়েছি যে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য এবং প্রবৃত্তিসমূহের ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য যেটুকু দেখা বা শোনার প্রয়োজন, তার বাইরে আমরা একটুও দেখি না বা শুনি না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আমরা এই ব্যবহারিক জীবনের তাগিদে ও প্রবৃত্তির তাড়নায় নিরন্তর ধাবমান। আমাদের বাসনার পরিতৃপ্তি, আমাদের ব্যবহারগত জীবনের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তা নিয়েই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করি। বেড়াল দেখলেই যেমন তাকে তাড়া করে যাওয়া রীতি, তেমনিধাবা চেয়ার দেখলেই অফিসের বড়বাবু তার উপর উপবেশন করেন অভ্যাসবশেই। মাংস দেখে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় কুকুরেরা যেমন একইরকম ব্যবহার নিত্য করে, ঠিক তেমনি অভ্যাসের বশবর্তী হলে আমাদের

ব্যবহারেও কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে না। আমরা নিত্যব্যবহার্য বস্তু-জগতটাকে অন্য চোখে দেখতে শিখিনি। জলের লহর যতই লীলাময় হোক্ না কেন, তৃষ্ণার্ত মানুষের সেদিকে কোন লক্ষ্য থাকে না। সে চায় গণ্ডুষ ভরে জলটুকু পান করতে। বিষয়ী মানুষ বৈষয়িক উন্নতির আশায় পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়; বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণায় নব নব ফলাকাঙ্ক্ষা করেন; ক্ষুধার্ত এবং কামাতুর মানুষ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিত্য ছুটোছুটি করছেন। একটা ব্যাপার থেকে অন্য একটা ব্যাপারে, কাল থেকে কালান্তরে এই তুচ্ছকে আশ্রয় করে চলছে নিত্য গতায়াত। এঁদের অভিজ্ঞতা স্বল্প, এবং ফল শূন্যতা। প্রবৃত্তির কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন পরিতৃপ্তি ছাড়া অন্য দিকে এদের লক্ষ্য নেই। এর বাইরেও যে জীবনের অর্থ ও ব্যঞ্জনা সুব্যাপ্ত; সে তত্ত্বটুকু একেবারেই অনাদৃত এঁদের চোখে। এরা ভুলে যান যে আশু প্রয়োজনের বাইরে যে জগৎ, তার দিকেও চোখ মেলে দেখার প্রয়োজন আছে।

শিল্পীর মুখ্য কর্তব্য হল আমাদের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতাকে প্রাণময় করে তোলা; এই প্রাণের সঞ্চারটুকু ঘটাতে পারলেই আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী—তা তিনি চিত্রকরই হোন্, কবিই হোন্, ভাস্করই হোন্ অথবা স্থপতিই হোন্ তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুতে এমন একটু জাদুর ছোঁয় বুলিয়ে দিতে হয় যার ফলে রসিকসুজন গান শুনে আনন্দ পায়, বোদ্ধা মানুষ ছবি দেখে হয় পুলকিত। মন রসসমুদ্রে অবগাহন করে আনন্দাভিষিক্ত হয়। সে আনন্দ হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ, সে আনন্দ আকস্মিকতার স্পর্শে উদ্বেল, অনিশ্চয়ের ব্যঞ্জনায় উৎসুক। সে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দে ব্যবহারিক জীবনের কোন স্পর্শ থাকে না। আরাম কেদারায় শুধুমাত্র বসবার আমন্ত্রণটুকুই এসে পৌছয় না; গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসেবে তার রূপ ও রং মনকে টানে; ছবিতে যখন সেই আরাম কেদারার রূপটুকু বাঙ্ময় হয়ে ফুটে ওঠে তখন রসিকজন তার মধ্যে প্রাণ প্রত্যক্ষ করেন; সে তখন আর শুধুমাত্র কাঠ আর বেতের সমষ্টিমাত্র নয়। তার মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে শিল্পীর প্রতিভার জাদুতে। ঐ যে অপসৃয়মান মানুষটি ওঁকে আমার গোষ্ঠীভুক্ত

করতে হবে তা সে যে কোন উপায়েই হোক্, অথবা তুচ্ছ জ্ঞান করে ওকে একেবারেই ভুলে যেতে হবে—এই ধরনের চিন্তা শিল্পীজনোচিত নয়। শিল্পী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিত্রীর অনুরাগ নিয়ে; সে একাগ্র দর্শনে উত্তেজনাও আছে, আর আছে সেই উত্তেজনার শান্তি। এই দেখা শুধুমাত্র ঘটন নয়, এই দেখা কর্মসিদ্ধির কৌশল মাত্র নয়। কাম বা ক্রোধের উদ্রেকও এই দেখায় নেই। এই দেখার মুহূর্তটি সীমাহীন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ও প্রাণময়; সুদৃঢ় শৃঙ্খলায় বিধৃত। এ দেখা বিমূঢ় চোখ মেলে শুধু তাকিয়ে থাকা নয়। এ দেখার অর্থ হল বিষয়কে জানা—একে শিল্পী জানছেন সুসম্বদ্ধ প্রাণময় বিষয়রূপে। আর এই ভাবে দেখছেন বলেই এ দেখায় আনন্দরসের ছোঁয়া এসে লাগে। শিল্পী সুন্দরকে অবলোকন করেন অতি-চেনা পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও।

চিত্রীরা বলেন যে ছবিতে কখন কখন নিষ্প্রাণ অংশের দেখা পাওয়া যায়। চিত্রী যখন ঠিক রঙের ব্যবহারটুকু যথাস্থানে করতে পারেন না, তখন দর্শক চিত্রীর রঙের খেলায় আকৃষ্ট হয় না। আবার চিত্রীর চিত্ররূপটুকু যদি অসংলগ্ন হয় তা হলেও চিত্রশিল্পে এই নিষ্প্রাণ অংশের আবির্ভাব ঘটে। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়ও এই নিষ্প্রাণ অংশের ছড়াছড়ি। শিল্প জীবনের এই নিষ্প্রাণ অংশকে অপসারিত করে। স্থাবর জীবন শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে; জীবনকে নতুন প্রাণনায় অনুপ্রাণিত করে 'সামগ্রিক শিল্প' (comprehensive art) তাকে নতুন রূপ দেয়। জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাও শিল্প-উপজীব্য হয়ে নবতর ঐশ্বর্যে গুণান্বিত ও নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়। অপরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটুকু সখ্যতা ও স্নেহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারটুকু এমন সঙ্গত ও সুন্দর করতে হবে যেন উদ্দীপক হিসাবে তা কেবলমাত্র সুন্দরতর প্রতি-ব্যবহারেরই পুরোধা হয়। শিল্পীর বা লেখকের কাছে যথাযথ উদ্দীপক যেমন শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টিরই সহায়ক হয় তেমনিধারা আমাদের ব্যবহারও যেন অপরের কাছে সদাচারের উদ্দীপক রূপে কাজ করে। প্রাত্যহিক জীবনে যাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, যাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বোঝাপড়া করতে হয়, তাদের সঙ্গে এই যোগটুকুকে আমরা কবিতার সঙ্গে, সঙ্গীতের সঙ্গে, চিত্রের সঙ্গে যে সাগ্রহ-সুন্দর যোগটুকু রক্ষা করতে সদা-উৎসুক, তার স্বগোত্র মনে করব। যতিহীন শিল্প-সৃষ্টি করা, নিরলস সৌন্দর্য রস আস্বাদন

করাই হল জীবনধারণের পরমার্থ। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু করি না কেন তাকেই শিল্পসৌকর্য দিতে হবে; আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেই নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দরসটুকুকে খুঁজে পেতে হবে। তবেই জীবনের ধারা হবে সুশৃঙ্খল, স্বতোৎসারিত, সুসমঞ্জস ও স্বাধীন।

জীবনের সুসীম গতিচ্ছন্দ যা জীবনকে শিল্প-মর্যাদায় ভাস্বর করে তোলে তা দার্শনিকের কল্পনা ও কবির স্বপ্নবিলাস মাত্র হয়ে রইল। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানিটুকুই বড় হয়ে দেখা দেয় আমাদের জীবনে; স্বাস্থ্যহানি, ক্লান্তি, অবসাদ, দারিদ্র্য, মধ্যবিত্ত-জীবনের দুঃসহ বোঝার ভার—এরা একসঙ্গে উদ্বৃত্ত শক্তিটুকুকে গ্রাস করে। ক্লেদহীন নির্মল অধ্যাত্মশক্তি নিবীর্য নিশ্চল জড় বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। সূচ্যগ্র বুদ্ধি অপটু অক্ষম শরীরকে আশ্রয় করে থাকে। সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি এই স্থূল জগতটাকে নিয়ে কাজ করে। আমাদের অভিজ্ঞতা-পারাবারের এই নিষ্প্রাণ অংশগুলিকে এড়িয়েও চলা যায় না। এই স্থূল, বিশৃঙ্খল জগতটাকে আশ্রয় করে জীবনকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। তাই আমাদেরও এমন সব কাজ করতে হয় যা একান্তই আকস্মিক ও ব্যবহারগত লক্ষ্য-সন্ধানী। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা অবকাশ চাই, এই অবকাশটুকু পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টারও অন্ত নেই। শান্তির আশায় আমরা ছুটোছুটি করে বেড়াই। এর ফলে আমাদের প্রাণশক্তির হানি ঘটে; আমাদের যৌবনের শক্তিতে ভাঁটা পড়ে। মূঢ় পার্শ্বচরের দল আলাপচারীকে নীরস কথাবার্তায় পর্যবসিত করে। নোংরা পথঘাট, অপরিচ্ছন্ন গৃহপরিবেশ, ক্লান্তিহীন আনন্দ আস্বাদনের অন্তরায় হয়ে ওঠে। জীবন যে আনন্দরসের আকর—এ স্বপ্নই থেকে যায়।

তাইত শিল্প ও শিল্পরসিক ললিতকলার জগতে পালিয়ে যান। এবং এই কারণেই ললিতকলাকে 'জীবন থেকে পলায়ন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা দুটি বিশেষ অর্থে এই পলায়নকে ব্যাখ্যা করতে পারি। ললিতকলার জগত শিল্পীকে এমন একটা লোকের সন্ধান দেয় যেখানে শিল্পীর বুদ্ধি শিল্প-বস্তুকে নিয়ে আপন ইচ্ছামত ভাঙাগড়া করতে পারে। কবি বা সংগীত-কলাকারের আঙ্গিকগত সমস্যা বা অসুবিধা হয়ত কিছু কিছু থাকে কিন্তু সেগুলির সমাধান করা দুঃসাধ্য নয়। গায়ক গণিতবিদের মতই জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করেন সত্য কিন্তু তাঁর শিল্পের জগত দুরধিগম্য নয়। এ জগত

বিশাল, এ জগত পরাবিদ্যাগত। এ জগত মুক্তির আলোবাতাসে ভরপুর; এ জগতে গায়কের বুদ্ধি নির্বন্ধ, তাঁর সৃষ্টি-শক্তি আপন লীলায় উচ্ছল।

এমন কথা প্রায়ই বলা হয় যে শিল্পীরা ব্যবহারগত জীবনে বড়ই অসহায় বোধ করে থাকেন। ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলিতে শিল্পীমনকে আকৃষ্ট করবার মত কিছুই থাকে না। শিল্পী-মন এর দ্বারা প্রতিহত হয়। ব্যবহারিক জীবনের বিভ্রান্তিকর স্থূল বৈচিত্র্যে শিল্পীর শিল্পচেতনা দিশেহারা হয়ে পড়ে। শিল্পের সূক্ষ্ম জগতে শিল্পী আপনাকে খুঁজে পায়। ব্যবহারিক জগতে শিল্পীকে যেমন অদ্ভুত মনে হয় তেমনি শিল্পীও ব্যবহারিক জগতটাকে নিতান্তই অর্থহীন মনে করেন। মহামূল্য শিল্পী-মন একটু খুঁতখুঁতে হয়; তাই সে মনের কাছে ব্যবহারিক বস্তুজগতের স্থূল বৈচিত্র্যটুকু অগ্রাহ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রগত বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে শিল্পীর মানস-সত্তা করবার কিছুই খুঁজে পায় না। শিল্পী-মনের কাছে বিভেদ হল অন্তরের দ্যোতক। কবিরা অনেকেই জড় জগতের ঘটনাবর্তকে এড়িয়ে গেছেন কেন না তাঁদের সংবেদনশীল কবিসত্তার সঙ্গে জগতের স্থূলতা ঠিক খাপ খায় নি; তাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন, নির্বস্তু শিল্পলোকে রোমান্টিক শিল্পসৌধ রচনা করেছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই দুচোখ মেলে দেখেছেন, সবটুকুকে গ্রহণ করেছেন নির্বিচারে। আঁদ্রে জিদ বলেছেন যে এরা যেন গুণে গুণে এক এক করে বিশাল প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়েছেন। রেমব্রাণ্ড ও ডেগাসের মত ভিন্নধর্মী চিত্রীরা জগতকে এবং জীবনকে দেখেছেন তাদের স্বাক্ষাৎরূপে, তাদের পীড়াদায়ক অস্তিত্বে। তাঁরা দেখেছেন ক্লান্ত শ্রমিককে, প্রৌঢ়া রমণীকে; তাদের নিরানন্দ অস্তিত্বকে এই ধরনের শিল্পী আপন মনের মাধুরী-মিশিয়ে, উজ্জ্বল রঙে ও রেখায় উন্নীত করেন অপূর্ব প্রশান্তির পর্যায়ে। কিন্তু সব শিল্পীই এই অসাধ্য সাধনটুকু করতে পারেন না। এমন অনেক শিল্পী আছেন, যাঁদের সৃষ্টিশক্তির হয়ত ন্যূনতা নেই কিন্তু সাহসের অভাব রয়ে গেছে তাঁদের মধ্যে। তাঁরা বাস্তব জগতের রূঢ়তাকে সহ্য করতে পারেন না। তাই তাঁরা বস্তুজগত থেকে পালিয়ে গিয়ে রঙ রেখা, আলো ও শব্দ দিয়ে গড়া শিল্পের সৌন্দর্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উনিশ শতকের ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি-লাভের জন্য মহাকবি শেলী এক আদর্শলোকের সন্ধান করলেন। আধ্যাত্মিক

সৌন্দর্যে সে আদর্শলোক হল প্লেতোনিক এবং গাণিতিক অতিনির্দিষ্টতায় তা হল ক্লাসিক। বধিরতাক্লিষ্ট বীটোফেন নাইনথ্ সিমফনির সুরলহরী মুগ্ধ হয়ে শোনেন; জগতকে দেওয়া তাঁর শেষ সংগীত—যার মধ্যে পরম সৌহার্দ্য ও অসীম আনন্দের বার্তা মূর্ত।

চিত্তের যে ধরনের প্রবণতা থাকলে শিল্পী রোমান্টিক শিল্পী বলে আখ্যা পায়, ঠিক সেই ধরনের প্রবণতাই আবার রসিককে রোমান্টিক শিল্পের রসাস্বাদনে সহায়তা করে। মন্দ স্বাস্থ্য, আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে মানসিক দুশ্চিন্তা ও প্রেমঘটিত ব্যাপারে অনিশ্চয়তার জন্য অনেক রসিকসুজনই জীবনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কাব্যের, সংগীতের ও চিত্রকলার আনন্দদায়ী পারবেশে আত্মগোপন করে; নেশাখোরের নেশায় যে আনন্দ, রসিকসুজনের শিল্পানন্দের আস্বাদনেও সেই একই আনন্দ। দোকানের পসারিণী যে উপন্যাসটি পড়ছে, তার মধ্যেই তার মুক্তি, তার আনন্দ। সেই থেকেই সে পায় রাজকন্যা, জমিদারতনয়া ও চিত্রতারকাদের অমিত ঐশ্বর্যের গৌরবের অংশটুকু; তাদের মতই সৌন্দর্য, সম্পদ ও স্বাধীনতা আস্বাদন করে। সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী তার কাঠের চৌপায়া ছেড়ে রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারে তার রোমহর্ষক উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে অবগাহনের সঙ্গে সঙ্গে। সে তখন উপন্যাসের নায়কের মতই শক্তি, বল ও বীর্যের অধিকার পায়, তার দুঃসাহসিকতা তখন উপন্যাসের নায়কের মতই দুর্বার হয়ে পড়ে। মনোরথে তখন তার যাত্রা শুরু হয় দেশ থেকে দেশান্তরে।

আমাদের চারপাশের জগত থেকে পলায়ন করবার মাত্র একটী পথই নেই। উপন্যাস হল মানুষের পলায়নীবৃত্তির একটী সড়ক; এ ছাড়া অন্যান্য পথও রয়েছে। আমরা মনে মনে যে পথে যাবার কল্পনা করেছি অথচ যে পথে যেতে পারিনি সেই পথে আমরা যাত্রা করি কল্পনার রথে চড়ে। যেসব দেশ আমরা দেখিনি, যেসব প্রাসাদের কোন বাস্তব অস্তিত্বও ছিল না, কল্পনায় আমরা সেই দেশ-ভ্রমণে যাই, সেই সব প্রাসাদে অধিষ্ঠান করি। অন্যান্য শিল্পও এই ধরনের পলায়নের সূক্ষ্মতর পন্থা নির্দেশ করেছে। মহাদার্শনিক সোপেনহয়র অতীতে এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক ঔৎসুক্য হল বৈরাগ্যের নামান্তর, অবশ্য নন্দনতাত্ত্বিক ঔৎসুক্যকে যে ধরনের বৈরাগ্য বলে ভাবা হয় ঠিক সেই ধরনের বৈরাগ্য এ নয়। যে কোন একটী ছবির দিকে

তাকালে সাময়িকভাবে আমরা যে আমাদের স্বভাবের হাত থেকে মুক্তি পাই, একথা অবশ্য স্বীকার্য। সেই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃপক্ষে আমরা ছবিটা দেখি শুধুমাত্র ছবিটাকে দেখার জন্যই। ছবিটা দিয়ে কী কাজ হতে পারে, আমার ব্যবহারগত জীবনের লক্ষ্যসিদ্ধির কতখানি সহায়তা হবে ছবিটা দিয়ে, এসব কথা ভাবি না। ছবিতে আঁকা আপেলের বর্ণনা-সুষমার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাক, দু'চোখ ভরে তার রূপ দেখি, ক্ষুন্নিবৃত্তি করার কথাটা মনে আসে না। আমাদের ব্যবহারিক লোলুপ দৃষ্টিটার জায়গায় শান্তবৈরাগী নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টির আবির্ভাব ঘটে। দার্শনিক সোপেনহয়রের ভাষায় বলি, জ্ঞান ক্ষণিকের জন্য অবাধ ইচ্ছাটাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে কী ভাবে রোমান্টিক নৈরাশ্যবাদ ও রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিকতা যুক্ত হয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে। মানুষের লোলুপ ইচ্ছাশক্তি তার আপন পূর্ণতা পেলো না, শান্তি পেলো না তার চারপাশের জগতে। বিধাতা বোধ হয় তার পরিবেশকে এমনি ব্যর্থ করেই গড়েছিলেন। খণ্ডিত জীবনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পরস্পর অসম্পৃক্ত, তাদের কোন অর্থই বোধগম্য হয় না। এই জীবনের খণ্ড অংশগুলির মাঝে দাঁড়িয়ে হয়ত এমন একটু অবকাশ পাওয়া যায় যা আলো দিয়ে, রঙ দিয়ে, গান দিয়ে ভরা। পেটার তাঁর The Renaissance-এর উপসংহারে এই ধরনের এক চিত্তহারী অবকাশের কথা বলেছেন। আমাদের বুদ্ধি যখন পরাস্ত হয়, অনুভূতি যখন তল পায় না তখন এপিকিউরীয় আনন্দলোকে আমরা আশ্রয় খুঁজি। আমরা যতক্ষণ নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে এই আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকতে পারি, ততক্ষণ জীবনটা কুসুমাস্তীর্ণ বলে প্রতীতি হয়, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাই। দ্বিতীয় রিচার্ডের মত অপ্রীতিকর অসংলগ্ন অভিজ্ঞতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সুরের-জগতে আশ্রয় নিই। অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করি তখনি যখন মর্মরে গাঁথা শিল্পরূপের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই, চিত্রীর সৃষ্টি একটী সুন্দর মুখকে নিরীক্ষণ করি অথবা দেওয়ালের গায়ে প্রলম্বিত অস্পষ্ট মায়াচ্ছন্ন ছায়াগুলোকে বসে বসে দেখি। সঙ্গীতে মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। আবার সাহিত্যে মানুষের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হই, অনুভব করি তার মনোহারী স্পর্শের প্রভাব। দ্রষ্টার চোখে সুন্দর অপূর্বরূপে ঝলমল করে ওঠে, তার মনে শান্তভাবের সঞ্চার হয়। একটা

নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের আবেগে সে তার পারিপার্শ্বিকের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। আমাদের ব্যবহারগত জীবনের দিকে বিশেষ কোন আকর্ষণ ললিতকলায় নেই ; তার লক্ষ্য হল বস্তুজগতের অন্তরশায়ী মৌল সত্তাটুকুকে সকলের সামনে মেলে ধরা। যে দ্রষ্টা শিল্পকর্মকে যথাযথ অবলোকন করেন তিনি তখনকার মত আত্মবিস্মৃত হন, আপনার চেতনা, মন এবং আত্মা সম্বন্ধেও তিনি পরম উদাসীন। তখন তিনি শিল্পলোককে আপনার আয়ত্তে পেয়েছেন। ভাবেই তাঁর পরম পরিতুষ্টি।

এই তত্ত্ব তাঁদের কাছে গ্রাহ্য যাঁরা মননধর্মের সঙ্গে জগত এবং জীবন সম্বন্ধে একটা স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে যুক্ত করেছেন। সৌন্দর্যের পূজারীরা যেন বিষাদমগ্ন মন নিয়ে ধূসর, রহস্যময় বিলীয়মান এক জগতে অরূপের সন্ধানে সঞ্চরমান। এই জগতের প্রতি তাঁদের লক্ষ্য নেই। ঈশ্বরসন্ধানী ছুটে যান মরুভূমির নির্জনতায়, নন্দনতাত্ত্বিক আশ্রয় নেন গজদন্ত-মিনারের সুউচ্চ চূড়ায়। এঁদের মূলমন্ত্র হচ্ছে—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে—।' তাই তাঁরা আপন মনের প্রশান্তিটুকু খুঁজে পান আপনার শিল্পরূপের মধ্যে যেমন করে ভক্ত আপনার মানসিক শান্তিটুকু ফিরে পান ভগবানের সান্নিধ্যে।

পলায়নের তত্ত্ব দিয়ে শিল্পরূপের এই যে ব্যাখ্যা এ ব্যাখ্যা কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার সবটুকুকে প্রতিভাত করতে পারে না। শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরস আস্বাদনের অনন্ত বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বরঞ্চ ব্যঙ্গ বলে মনে হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে যেমন মানুষকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে তার অর্থ নৈতিক সত্তায় শুধুমাত্র রূপান্তরিত করা হয়েছিল ঠিক তেমনি এই তত্ত্ব মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক সত্তাটুকুকে বিচ্ছিন্ন এবং একান্ত করে বিচার করেছে। আমরা সব সময়ে ত আর শিল্পরূপে মগ্ন হয়ে থাকি না। শিল্পের সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা যখন ডুবে যাই তখন চেনা জগতটাকে, আমাদের ব্যক্তিসত্তাটাকে আমরা বিসর্জন দিয়ে বসি সাময়িকভাবে ; শিল্প-রস আস্বাদনের সময় এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার, যে চোখ শিল্পরূপ দেখে তা হল একটি ব্যক্তিমানুষের চোখ—যে চোখের আলোয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তার অনন্ত আগ্রহ প্রতিফলিত। সীমাহীন ঔৎসুক্য এবং অন্তহীন অনুভূতির ছায়া নিত্যনিয়ত ভাসমান। যে কান সঙ্গীত শুনছে সে কানের শব্দানুষঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা আছে, শব্দের অর্থ ও

ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে সে কান সচেতন। অবশ্য অনেকের কাছেই শিল্প হল সৌন্দর্যলোকে, কল্পনার রূপলোকে পলায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। জাগতিক দ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তা থেকে তারা মুক্তি পান শিল্প-স্বর্গের পরম প্রশান্তির মধ্যে।

গতানুগতিক চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে আমরা শিল্পসম্বন্ধীয় এই পলায়নী তত্ত্বটুকুকে ব্যাখ্যা করতে পারি। The Birth of Tragedy গ্রন্থে দার্শনিক নাৎসে গ্রীক ট্রাজেডি তথা সাধারণভাবে সকল ললিতকলার আপাতঃবিরোধী উপাদানগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ্যাপোলোনিয় ও ডায়োনিজিয়— এই দ্বিবিধ উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এ্যাপোলোনিয় উপাদান গ্রীক-ট্রাজেডিকে স্থৈর্য দিয়েছে। ডায়োনিজিয় উপাদানই গ্রীক ট্রাজেডির প্রাণ-শক্তির উৎস। চারুশিল্প শুধুমাত্র শান্তি আর স্থৈর্যের উৎসই নয়, চারুকলা অগ্নিস্রাবীও হয়ে উঠতে পারে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর নাগপাশে বাঁধা যে মন দ্বিধাগ্রস্ত ও নিরুৎসাহ, সেই মনই শিল্প-রসাস্বাদনের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে প্রজ্জ্বলিত উৎসাহে অগ্নিময় হয়ে ওঠে। রোমান্টিক সুরস্রষ্টা ভাগনারের সঙ্গীতে দার্শনিক নাৎসে এই ডায়োনিজিয় উপাদানের আধিক্য লক্ষ্য করেছিলেন। ভাগনরের সঙ্গীতের এই উপাদানটুকু নাৎসকে সমধিক পরিমাণ আকৃষ্ট করেছিল। আনাতোল ফ্রাঁসের মতে সাহিত্য হল আধুনিক জগতের মানুষের কাছে অহিফেন মাত্র। অবশ্য এ কথা সঙ্গীতের সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য। যে কোন প্রেক্ষাগৃহে একতান সঙ্গীতের সময় সমবেত শ্রোতাদের মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাদের অবরুদ্ধ অনুভূতি সঙ্গীত রসধারার মধ্যে যেন মুক্তি পায়। সঙ্গীতের ভাষায় যে কথা বলা হচ্ছে সে কথা তাদের নিজেরই কথা—সেইসব কথা যা তারা সাধারণ ব্যবহারিক জনসমাজে বলতে লজ্জা পেতো। ভাষার অপ্রকট অবরুদ্ধ ভাব সঙ্গীতকে আশ্রয় করে অন্তরে উদ্বেল হয়।

আমাদের প্রবৃত্তিগত উন্মাদনার প্রকাশই যে কেবল শিল্পে ঘটে তা নয়। দৈনন্দিন জীবনের স্থূল দাবী নিরন্তর মেটাতে গিয়ে আমরা অনুভূতিভারে সূক্ষ্ম তারতম্য লক্ষ্য করি না। মনের জগতে বহু সূক্ষ্মতর চিন্তন প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করি। এই সব সূক্ষ্ম চিন্তা ও অনুভূতির কথা আবার আমাদের ভাষায় প্রকাশ করাও যায় না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্থূলপরিবেশে এই সব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চিন্তার স্থানও হয় না; তাই এরা শিল্পের জগতে

আপনার স্থান করে নেয়। তাই দ্রষ্টার দৃষ্টিতে মনে হয় যে শিল্পে জীবন থেকে একান্ত পলায়নটুকুই বুঝি বড়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প জীবনকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। শিল্প জীবনকে করে উজ্জীবিত।

প্রথমেই উজ্জীবনের কথা বলি; প্রাণিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় হল তার পরিবেশের অবদান। এই পারিপার্শ্বিক অনন্ত পরিবর্তনশীল ও বিপদসঙ্কুল। কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই তত্ত্বটুকুই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে নিয়ত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে ধীরে ধীরে তার ইন্দ্রিয়গুলি পরিস্ফুট হয়েছে, সক্রিয় হয়েছে বিপদসঙ্কুল পরিবেশের তাড়নায়। আলোয় সংবেদনশীল রঞ্জিত নেত্রবিন্দুই ক্রমে নেত্রযুগলের সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ইন্দ্রিয়টির সাহায্যে জন্তুজানোয়ারেরা দূরাশ্রিত বিপদকে এড়িয়ে গেছে, আবার লোভনীয় বস্তু-লাভ, অভিপ্রেত লক্ষ্য সিদ্ধির সহায়তা করেছে প্রাণীর এই নেত্রদ্বয়। তেমনিধারা প্রাণীর কাজও বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার বর্তমান রূপটুকু পেয়েছে। আদিতে জন্তুজানোয়ারেরা যে যন্ত্রটির সাহায্যে শুধুমাত্র বিপদের সঙ্কেত ও লোভনীয় বস্তুর আমন্ত্রণটুকু বুঝতে পারত কালক্রমে তা-ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের জটিলরূপ পরিগ্রহ করেছে। পশুর আদিম স্থূল ঘ্রাণশক্তি আদিতে শুধুমাত্র বিপদের কথা, খাদ্যের গোপন অবস্থিতি, লোভনীয় বস্তুর ইশারাটুকুই বহন করত। স্বাদ কেবলমাত্র বিষাক্ত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মধ্যে প্রভেদটুকু করতে পারত। স্পর্শও প্রাণিজগতের ইতিহাসের আদিতে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা ও প্রজননের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এ-কথা বলা চলে যে সৃষ্টির আদিতে প্রাণীদের ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যবহারগত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। নন্দনতাত্ত্বিক কোন মূল্য-বোধের প্রেরণায় এদের সৃষ্টি হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রয়োজন ব্যবহারগত; একধরনের সৃষ্টিহীনতা স্বভাবতই আমাদের সকলকেই গ্রাস করেছে; এই অজ্ঞতা হল প্রবৃত্তিজাত; আমাদের আশু প্রয়োজনটুকু মেটানো ছাড়া অন্য কোন দিকে আমাদের লক্ষ্য নেই।

শিল্পকর্মের শিল্পমূল্য অথবা শিল্পীর কৃতিত্ব আমরা তখনই স্বীকার করব যখন শিল্পকর্মটি আপনার বিষয়বস্তুটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে

পারবে। আমাদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বাহী আবেদনে সাড়া দেবে। স্টিফেন ক্রেন একটি গল্প বলেছেন। বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে তিনটি লোক একটি ছোট নোকায় ভেসে যাচ্ছে। তারা উপরের উন্মুক্ত দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশের রঙটুকুও দেখবার অবকাশ পায় নি, তা দেখার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ তাদের ছিল না। আত্মরক্ষার তাগিদে তারা শুধু সম্ভাব্য ত্রাণকর্তাকেই খুঁজেছে।

শিল্পরস আস্বাদনের সময়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে তীব্রতর করে তুলি সাময়িকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে নিরুদ্ধ করে দিয়ে। আমরা পটে আঁকা ছবি দেখে, বেহালার মধুর তানে সুরেলা কণ্ঠে গান শুনে আনন্দরসে ডুবে যাই। দর্শন এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মত পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্পর্শপ্রমুখ অন্য তিনটি ইন্দ্রিয় নন্দনতাত্ত্বিক রস-আস্বাদনে আমাদের সাহায্য করে না; প্রাণধারণের ব্যাপারে তাদের উপযোগিতা সমধিক। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের জগতেই শিল্পকলার রস-আবেদনটুকু সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা বস্তুর রঙকে সব সময়েই উপেক্ষা করি; কিন্তু চিত্রীর কাছে সেই রঙের আবেদনটাই সব চেয়ে বড়, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক জীবনে এবং ভাবের আদান-প্রদানে সঙ্গীতের স্বরসংগতি ও ছন্দলয় না ব্যবহারযোগ্য না বা মূল্যবান। গায়ক এবং গীত-রসিকের কাছে কিন্তু তা বহুমূল্য সামগ্রী, বহু সাধনার ধন। সেখানে ইন্দ্রিয়গত সংবেদন আর শুধুমাত্র কাজ করার নির্দেশটুকু দেয় না; সেই সংবেদন তখন অনন্ত আনন্দ রস আস্বাদনের সহায় হয়।

এইভাবে বিচার করলে বলা চলে যে শিল্পের প্রত্যন্ত আবেদন, শিল্পের মৌলভিত্তি হল সংবেদন-গত। বস্তুর বহিরঙ্গ রূপটুকু শিল্পে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়; তা হয় পরম সন্তোষের আকর। শিল্পীর আঁকা স্থিরচিত্রে স্থাবর বস্তুর রূপটুকু ফোটে তার অঙ্কনশক্তির প্রসাদগুণে; ছবিতে আঁকা ফলের ক্ষেত্রে নীলচে, সবুজ ও বেগুনির বর্ণবাহারই আমাদের আকর্ষণের প্রকৃত উৎস। আমরা ইন্দ্রিয় সংবেদনের আহ্বানে সাড়া দিই। যে সব নীতিবাগীশেরা উন্নাসিক হয়ে শিল্পকে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভ্রান্তি' বলে পরিহাস করেছেন, তারা কিন্তু নিন্দার আবরণে সত্যকেই ব্যক্ত করেছেন। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছকে বাঁধা মানুষ আপনার দৃষ্টিশক্তির সজীবতাটুকু, তীক্ষ্ণতাটুকু ধীরে ধীরে

হারিয়ে ফেলে ; সেই হারানো সম্পদ আবার ফিরে আসে ছবির রঙ দেখতে দেখতে। গান শুনতে শুনতে কাণও তার লুপ্ত শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতাটুকু ফিরে পায়। ছবিতে যে রঙ, যে রূপ শিল্পী অনুস্যূত করে দিয়েছে, গানে যে সুরবাহার ঝলমল করছে, তা-ই কেবল রসিকজনের চোখ দেখে নেয়, কাণ নির্দিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে। তারা শিল্প-সম্ভাবনাকে দেখে না। শিল্পকারকে প্রত্যক্ষ করে মাত্র।

আমাদের সংবেদনকে শুধুমাত্র তীব্রতর ও তীক্ষ্ণতর করাই শিল্পের কাজ নয়। তার কাজ আরো ব্যাপক। আমাদের জীবনের দৈনন্দিনতায় আমরা অনুরূপ পরিবেশের একই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করি ; আমাদের অনুভূতির প্রতিক্রিয়া একই রকম হয়ে থাকে। এই পুনরাবৃত্তি আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিষ্প্রভ করে দেয় ; আমাদের অনুভূতিকে ম্লান করে তোলে। উপন্যাস এবং নাটকের সুকৌশল শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের অনুভূতিগুলো আবার জেগে ওঠে। এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, জীবন-মৃত্যুর সংঘাত, প্রেমের অভিঘাত যে সংকট আনে তা যে কোন শিল্পের আবেদনের চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ, অনেক বেশী তীব্র। এ কথা সত্যি। কিন্তু জীবনে এই ধরনের সংকটও সব সময়ে আসে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ধরনের অনুভূতির দেখা পাই তা ক্ষীণ এবং বৈচিত্র্যবর্জিত। অতি পরিচিত মানব অভিজ্ঞতায় যে ধরনের অনুভূতির প্রাধান্য দেখা যায় তাও গভীরতর, স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা পায় হ্যামলেটের মত ট্র্যাজেডির সংঘাতে অথবা আনা কারেনিনা প্রমুখ উপন্যাসের রসঘন কাহিনীতে। অধিকাংশ মানুষ সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে যে তাদের আদিম অনুভূতি কোন্‌গুলো, তাদের প্রকৃতিই বা কী এ সম্বন্ধে জীবন অভিজ্ঞতা থেকে তারা যা শেখে, তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করে সাহিত্য থেকে। আকারগত বিচারজ্ঞানের কাছে যে সব ভাব-অনুভাব ক্ষীণ এবং প্রাণহীন, তাকেই যখন কাব্য অথবা নাটকের উপজীব্য হিসেবে দেখি, তখন তা অত্যন্ত প্রাণবন্ত বলে মনে হয় ; অন্তরঙ্গতায় তা রঙীন হয়ে ওঠে। শেলীর রাজনৈতিক কবিতা পড়ে যাঁরা অগ্নিশিখার মত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন তাঁরাই হয়ত গড্‌উইনের Political Justice পড়তে পড়তে পড়েন ঘুমিয়ে। আরিস্ততল কথিত বন্ধুত্ব-বন্ধনের সূত্রাবলী যাঁরা নিস্পৃহভাবে পড়েন তাঁরাই হয়ত প্লেতোর সখ্যতা

সম্পর্কিত পরম রমণীয় কথোপকথনগুলি পড়তে পড়তে অনুভূতির আবেগে হন উদ্দীপ্ত।

উপরে আমরা চারুকলার দ্বিতীয় যে কাজটির কথা বলেছি তা হল আমাদের অভিজ্ঞতাকে চারুকলা অনেক পরিষ্কার পথে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। এ কথা ইন্দ্রিয়গত পর্যায়ে যেমন সত্য তেমনি সত্য চিন্তা ও মননের জগতে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে গতানুগতিক ছাঁচে ঢালাই করে দেয় একদিক থেকে আমাদের আবেগ-উত্তেজনা আর অন্যদিক থেকে আমাদের পরিবেশের গুরুভার। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্বরূপে যে কী ছিল তা আমরা ভুলে যাই। টুকরো টুকরো রূপ আর রঙে গড়া হল আমাদের এই অভিজ্ঞতা; ক্ষণিক মুহূর্ত জুড়ে এর ব্যাপ্তি; তার পরেই ঘটনাপ্রবাহে হয় এর আত্মবিসর্জন। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের চেনা জগত এই অনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে রূপ দেয়। যদি কোন পূর্বনির্দিষ্ট নকল দিয়ে অভিজ্ঞতাকে গ্রহনের রীতি না থাকত তা হলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমাদের দেখা অস্পষ্ট রূপ ক্রমে ক্রমে সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যে পরিণত হয়। আমাদের মনে যেসব ছাপ পড়ে তাদের মধ্যে আমরা কিছু না কিছু সংগতি এবং রূপের আভাস সকল সময়ই খুঁজে পাই। আমাদের স্বভাব এবং আমাদের প্রবৃত্তির পথ বেয়েই জীবনধারা প্রবাহিত হয়। আমাদের আচরণের শত অসংগতির মধ্যেও একধরনের সংগতি থেকে যায়। এমন কী নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বা অর্ধ-অচেতন অবস্থায়ও একেবারে বিশৃঙ্খলা সম্ভব নয়।

শিল্পকর্মে আমাদের সংবেদনগুলি একটি বিশেষ ধরনে, একটি বিশেষ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গভীরতর এবং সমৃদ্ধতর ব্যঞ্জনায় সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমাদের আবেগগুলিকে দৃঢ়তর পারম্পর্যে ও বৃহত্তর বিস্তৃতিতে বিধৃত করে। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণত এটি করা সম্ভব নয়। আমার সব সুখকর দিবাস্বপ্ন, সব কল্পনার আকাশে পাখা মেলা, এ সবই শিল্পের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, পায় একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য পারম্পর্যের মধ্যে বিকশিত রূপ।

উদাহরণের সহযোগে বোঝানোর চেষ্টা করি। যারা স্থির চিত্র আঁকেন না, এমন অনেক চিত্রকরই ফলের ঝুড়িতে ফল সাজান দেখেছেন বহুবার। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে আমাদের টুকরো টুকরো অসংলগ্ন সংবেদনগুলিকে

যুক্ত করে একটি সুসম্বদ্ধ সংযত সুন্দর ছবি এঁকে ফেলা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে কেবল পারেন সিজান বা ভারমিআরের মত শিল্পীরা। প্রায় সকলেই আমরা অন্ধ অহংকারের প্রমত্ততা অনুভব করেছি কখনও কখনও; প্রেম-ভালবাসা আমাদের মধ্যে যে অধিকারের প্রবৃত্তিটুকু জাগায় তার অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। এই অহংকারের অন্ধ প্রমত্ততার বিষময় ফলটুকু পরিষ্কার করে দেখানোর জন্য সোফোক্লিসের মত প্রতিভাধরের ঈডিপাস নাটক লেখার প্রয়োজন হয়। আর প্রেমজাত অধিকার বোধের বিয়োগান্ত পরিণতিটুকু বোঝানোর জন্য সেক্সপীয়রের মত অসীম প্রতিভাধর নাট্যকারকে 'ওথেলো' নাটক রচনা করতে হয়। জীবনে কখন না কখন মূঢ় অতি সাধারণ মানুষও জীবনের পরম বেদনাদায়ক নিস্ফলতা নিয়ে চিন্তা করেন; কখন বা প্রকৃতির সুন্দর শুভ্র, কল্যাণময় রূপটুকুর কথাও ভাবেন। কিন্তু সংগতিপূর্ণ চিন্তাসূত্রে এই সব ভাবনা চিন্তাকে তাঁরা দৃঢ়নিবদ্ধ রূপ দেন না। কিন্তু লুক্রোটিয়সের মত কবি এই সব অনতিনির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন ভাবনা চিন্তাকে সুসমন্বিত অন্তর্দৃষ্টির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দান্তে আবার অপূর্ব ঐশ্বর্যময় জীবন ও অদৃষ্টের বৃহৎ পটভূমিতে এই সব বিচ্ছিন্ন মননকর্মকে নির্দিষ্ট শিল্পরূপ দিয়েছেন। নানাবর্ণের বহু বিচিত্র সংবেদন লহরী এইভাবে ধরা পড়ে রূপকল্পের অতিনির্দিষ্টতায়। যে ভাব অস্পষ্ট, অনুক্ত ছিল তা কাব্যের, নাটকের অথবা উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে নির্দিষ্ট রূপ পায়। যে স্বপ্নের মেঘ মনের আকাশে ভেসে বেড়ায় তাকেই সঙ্গীতে অথবা সাহিত্যের মধ্যে এনে শিল্পী দেন অমরত্বের মহিমা।

তা হলে বলা যায় যে এক অর্থে শিল্প হল বস্তুর ভাবরূপ; বস্তুবাদী শিল্প বা রিয়ালিস্টিক আর্ট সম্বন্ধেও একথা সত্যি। কেন না জীবনের কোন অভিজ্ঞতার মধ্যেই শিল্পকর্মের অনুস্যূত কায়েমী শৃঙ্খলাটুকু, তার পরিকল্পনাটুকু, তার সুসমন্বিত রূপটুকু আমরা পাবো না। প্রকৃতির বিরাট সাজঘরে ক্ষণিকের দেখা ছকটি কখনই শিল্পীর আঁকা ছবির চিরায়তা লাভ করে না। জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতার আকস্মিকতা কখনই নাটকের সুপরিকল্পিত সুসন্নিবিষ্ট ঘটনার মর্যাদাটুকু পায় না। বস্তুর আদর্শায়িত ভাবরূপই হল শিল্প এবং এই শিল্প প্রকৃতির সামনে একটি মুকুর তুলে ধরে রাখে—সেই মুকুর যাতে বস্তুর রূপটুকু অনেক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে হয় প্রতিফলিত। সুকল্পিত

কৌশলের সহায়তায় শিল্পী প্রকৃতির অন্তরশায়ী ঐশ্বর্যটুকু আমাদের দেখান, জীবনের অন্তর্গূঢ় ভাবটুকুর অনুভব সম্ভব করেন। মননকর্মের নিগূঢ় সূত্রটিকে আমাদের চিন্তায় বিধৃত হতে দেন।

জীবনের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় ফিরে আসি। মনস্তাত্ত্বিক ও তর্কশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে সংবেদনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে অবধারণ ও অনুমান; আমরা বাঁধাকপি অথবা রাজামশাই এদের কাউকেই দেখি না। যে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট সংবেদনটুকু পাই তার ব্যাখ্যা আমরা করে থাকি। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের স্বভাব এরাই একধরনের শিল্পী। বাইরের জগতের বস্তুগুলিকে শুধুমাত্র 'সংবেদন' ভাবার পথে এরাই পরিপন্থী, এরা বস্তুকে রূপ দেয়, অর্থ দেয়। আমাদের বুদ্ধি যে রীতিতে সংবেদন লহরীকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়, শিল্প জোর দেয় সেই রীতিটুকুর উপরেই। শিল্পীর ক্যান্‌ভাসের উপর ছড়িয়ে দেওয়া টুকরো টুকরো রঙের পোঁচ একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ছবির মধ্যে বিধৃত হয়; তা হয়ত মুখের ছবি। সে মুখ হয়ত কোন নিবিড় অনুভূতিজাত ব্যর্থতায় করুণ। উপন্যাসে যে কথাগুলি বলা হচ্ছে তা কোন একটি অভিজ্ঞতার কথা, কোন একটি মানুষের জীবন কাহিনী অথবা নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতির ফলশ্রুতি।

এই সব চারুকলাই জীবনের ব্যাখ্যা করে; কেউ বা বেশী, কেউ বা কম। চিত্রীর সুশৃঙ্খল কল্পনাশক্তির কাছে যে অর্থে ঐ ফলের ঝুড়িটা আবির্ভূত হয় ঠিক সেই অর্থ টুকুই ছবিতে ফুটে ওঠে। শিল্পী সংবেদনগুলির অর্থ বলে দেয় তার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। হাজার হাজার মানুষের অস্পষ্ট অনুভূতির ব্যাখ্যা এবং এইভাবে তাদের আবেগনিরুদ্ধমনের ভার লাঘব করা শিল্পের অন্যতম কর্ম। Hamlet, War and Peace প্রমুখ উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে আমরা এই ধরনের ব্যাখ্যা পাই। সমগ্র মানব সমাজের অস্তিত্বটুকুর গূঢ়ার্থ মানুষের প্রকৃতি, তার প্রগতি এবং ভাগ্য, এ সবের ব্যাখ্যা আমরা Divine Comedy বা গ্যয়টের Faust-এর মধ্যে পাই। ম্যাথু আর্নল্ড যখন কাব্যকে জীবনের সমালোচনা রূপে ব্যাখ্যা করলেন তখন সেই ব্যাখ্যা সমগ্র শিল্পজগত সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারত। কেননা 'সমালোচনা' বলতে আমরা জীবনের যে কোন খণ্ডাংশ সম্বন্ধে যথাযথ মূল্যায়ন অথবা তার ব্যাখ্যাটুকু বুঝি। অবশ্য সাহিত্যে জীবনের বিশদ ব্যাখ্যা

থাকে। Rodin অথবা Michelangelo'র গড়া মূর্তি, Beethoven অথবা Debussy'র সৃষ্ট সঙ্গীত তার সামগ্রিক মৌল ধর্মে, তাদের যতি, তাদের গতি, তাদের প্রকৃতিগত আপন আপন মাধুর্যে মানব অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করে। Beethoven-এর Fifth Sympbony তে আমরা শুধুমাত্র কতকগুলি শব্দের সমষ্টিকে পাই না; তদতিরিক্ত কিছু সেই সঙ্গীতের প্রাণ। একটি মহৎ প্রাণ জগতকে এই সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাও করেছেন। শিল্পী Rembrandt-এর আঁকা Old Rabbis-এর ছবিতে অথবা El Greco'র আঁকা ছবিতে আমরা খালি চোখে যা দেখতে পাই, তদতিরিক্ত কোন নিগূঢ় অর্থ এদের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়ে থাকে। এইসব শিল্পকর্মের যাঁরা জনক তাঁরা তাঁদের জীবন-ধারণাকে, জীবনের নিহিতার্থটুকুকে আপন আপন শিল্পকর্মে অনুপ্রাণিত করে দিয়েছেন। তাঁরা শুধুমাত্র দিয়ে দেখেননি বা কান দিয়ে শোনেননি। এই সব শিল্পের ভাষা জীবনের গভীরতর অর্থটুকু করে এনেছে রসিক মানুষের কাছে।

অভিজ্ঞতাকে উজ্জীবিত করে তোলা, তাকে উজ্জ্বল করে তোলা এবং তার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা—এই তিনটি হল শিল্পের কাজ। বিভিন্ন চারু-শিল্প বিভিন্ন পর্যায়ে এই কাজটুকু করে থাকে, অনেকের কাছে শিল্প শুধুমাত্র স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও তদজাত আনন্দই হল শিল্পানন্দ। অনেকের চোখে শিল্প হল সেই ভাষা, যে ভাষার মাধ্যমে মানুষের আত্মা জীবনের গূঢ়ার্থটুকু উপলব্ধি করে। আবার অনেকের মতে মানব অভিজ্ঞতার সামগ্রিক মহৎ রূপটুকু শিল্পের মাধ্যমেই বাহিত হয়। সেই বাহন আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে, আবেগকে প্রাণবান করে। যে শিল্প খণ্ডশিল্প তা জীবনের লক্ষ্যকে নির্দেশ করে; মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই সেই লক্ষ্যাভিমুখী; বাইরের রূঢ় বাস্তবলোকও ভেতরের বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত আবেগের জগতের মতই সেই লক্ষ্যানুসারী। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর শিল্পপ্রকরণ যেমন আনন্দ দেয় ঠিক তেমনি রসস্রাবী হল পূর্ণাঙ্গ শিল্প সৃষ্টিটুকু। শিল্প কখন কখন আমাদের যে আনন্দের আস্বাদন দেয়, সেই আনন্দের স্বাদ মেলে প্লেতো-দৃষ্ট দার্শনিকের আদর্শলোকের কল্পনায়। একটি সিম্ফনির সুর-সংগতিতে ট্রাজেডির বিয়োগান্তক্রম পরিণতিতে, কাব্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যপ্রবাহে আমরা একটা সুশৃঙ্খল, সুসম্বদ্ধ

জগতের পূর্বাভাস পাই। শিল্প হল মানুষের বুদ্ধিজাত, মানুষের বুদ্ধির নামান্তরই হল শিল্পকর্ম। যে সমাজে শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজে মানুষের বুদ্ধি তার সকল প্রয়াসকে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে তার সকল প্রচেষ্টাকে। সুন্দর শিল্পকর্মে এই বুদ্ধিই সক্রিয় আবার শিল্পানন্দ আস্বাদনেও এই বুদ্ধিই ক্রিয়াশীল।

●

। ২ ।

শিল্প ও সভ্যতা

অনেক অনেক দিন আগে আরস্তিতল বলেছিলেন সে শিল্পের যথার্থ অনুধাবন করা সহজ হবে যদি আমরা শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করি। মানুষ আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শিল্পের মাধ্যমে বুদ্ধির সহায়তায় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা তার বুদ্ধির পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। এই সভ্যতার পূর্ণাঙ্গতার মধ্যে সভ্যতম মানুষ জীবন এবং শিল্পকে সার্থক করে তুলবে। সভ্যতার পথে অনগ্রসর হওয়ার অর্থ হল মানুষ তার দুর্বল প্রকৃতি ও অসংস্কৃত স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এখনো তারা মানুষের কর্মকে ও জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি, আমাদের সমাজনীতির রূপ আজ বড়ই অসংস্কৃত ও আদিম। কুসংস্কার, ভ্রান্ত অনুমান, স্বার্থ বুদ্ধি এবং অহেতুক ভয়—এরাই সমাজ জীবনে বুদ্ধির স্থানটুকু অধিকার করে বসেছে।

মানুষের ইতিহাসের প্রত্যূষ থেকেই তার বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে তার পশু-প্রবৃত্তির উত্তেজনাটুকুকে প্রশমিত করতে লাগলো। শুরু হল বুদ্ধির সাহায্যে পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজ। শিল্প প্রকৃতির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করল, তার স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করল। মানুষ তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ কর্মে আত্মনিয়োগ করল তখন, যখন সে কাঠ কুঠুরি ভাঙতে লাগল বন থেকে, আগুন জ্বালাল, পশুপালন শুরু করল, মাঠে বীজবপন করল, কুঁড়েঘর বানাল, গুহাখনন করল পরম আয়াসে। মানুষের রুজি রোজগারের জন্য, তার আশ্রয় তৈরী করার জন্য যে জীবন-শিল্পের একান্ত প্রয়োজন, সেই শিল্পের উদাহরণ আমরা উপরি-কথিত কাজগুলির মধ্যে

পাই। ব্যাপক অর্থে সমবেত সঙ্গীত প্রেক্ষাগৃহে অথবা জাদুঘরে সে শিল্পের আমরা দেখা পাই না যার দেখা পাই শস্যক্ষেত্রে, গোচারণভূমিতে এবং কৃষিকর্মে। বিপদ-সঙ্কুল অনিশ্চয় পরিবেশের মধ্যে প্রথম মানুষ নিরাপদ জীবন-ধারণের প্রণালীটুকু আয়ত্ত করেছিল। সৌন্দর্য সৃষ্টি করা বা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে জীবন-যাপন করার অনেক আগে এটা তাকে শিখতে হয়েছিল। আদিম জীবন সম্বন্ধে যে সব নৃতত্ত্ববিদ বহুদিন যাবৎ গবেষণা করেছেন তাঁদের মত হলো এই যে প্রয়োজনীয় যে সুন্দরের আগে এসেছে অথবা সার বস্তু সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ যে অলংকরণের পূর্বে জন্ম নিয়েছে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। করণীয় কর্তব্য সমাধা করতে করতে অসীম মানুষের কল্পনা তার অবকাশকে সুষমায় ভরে তুলেছে; এটুকু হল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন-জাত। পাত্র, ঝুড়ি প্রমুখ জিনিষের মধ্যে নানান রূপের আমদানি হল। আদিম মানুষ শুধু গুহানির্মাণই করল না, সে গুহাগাত্রে নানান ধরনের ছবিও আঁকল। রঙের রেখার মোহে মুগ্ধ হয়ে কারিগর মানুষ নিয়ে খেলতে বসল। আদিম মানুষের তৈরী বেতের ঝুড়ি, মাটির হাঁড়ি কুঁড়ি এই সব হাতের কাজ দেখলে শিল্পী আর কারিগরে বিশেষ ভেদ করা যাবে না।

ইতিহাসের বিচারে চারুশিল্প না কারুশিল্প, কে কার পূর্বে এসেছিল, উভয়ের অভ্যুদয় একই সঙ্গে কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও চারুশিল্পকে কারুশিল্প থেকে পৃথক করা হয়ে থাকে। সমকালীন সভ্যসমাজে এমন কতক-গুলি শিল্প রয়েছে যেগুলির কারুকুশলতা ও প্রায়োজনিক লক্ষ্যসিদ্ধির প্রতি আগ্রহ অতিমাত্রায় প্রকট। শিল্প-উৎপাদনের যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন প্রাচুর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলে চারুকলা সেই উৎপাদনের জগতে প্রতিষ্ঠা পায় না। যে উৎপাদন এই ধরনের কারুশিল্প থেকে জাত হয় তার লক্ষ্য থাকে প্রয়োজনের দিকে; সৌন্দর্যের প্রতি তা সাধারণত বিমুখ হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে শিল্প চালিত হয় তা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক, আমাদের অভাব মোচনের অনুকূল। তা আমাদের বস্ত্রসমস্যার ও গৃহ সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে; দ্রুত চলাচলের জন্য যন্ত্রযান, নদী পার হবার সেতু, সমুদ্র পারাপারের জন্য জাহাজ এ সবই এই যান্ত্রিক শিল্প থেকে পাই। সম্ভব হলে আমরা এগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলি।

যে সভ্যতায় মানুষের চিন্তাশক্তির সক্রিয় হবার ব্যাপক অবকাশ, সেখানে বাসগৃহকে সুষমামণ্ডিত করে গড়ে তোলা হয়; অবশ্য রৌদ্রাতপ, ঝড়জল থেকে মানুষকে পুরোপুরি রক্ষা করার ব্যবস্থাটুকু রেখেই। এ দুটি গুণ একই সঙ্গে বিরাজ করত। তেমনি ধারা পরিধেয় বস্ত্র একদিকে ঠাণ্ডার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করত আবার তাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলত; জাহাজগুলো নীল আকাশের বুকে তীরের মত সুন্দর দেখাত আবার তা বন্দরে বন্দরে জলপথে যাত্রার ব্যাপারেও আমাদের একান্ত আশ্রয়স্থল ছিল। আমাদের জীবনের অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাজারো কারণ লুকিয়ে রয়েছে যার জন্য আমাদের বাসগৃহগুলি সৌন্দর্যের আকর হয়ে ওঠেনি, তার জন্য অনেক নদীতেই সেতু বাঁধা হয়নি। উৎপাদন প্রাচুর্যই যেখানে আমাদের লক্ষ্য সেখানে এমনটি ঘটে; দ্বিতীয়তঃ একঘেঁয়ে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্যও এটা ঘটতে পারে। তৃতীয়তঃ যান্ত্রিক শ্রমশিল্প-আশ্রয়ী সভ্যতায় আমরা সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজনটির উপরে জোর দিই বলেও এমনটি সম্ভব হচ্ছে। উত্তর ইংলণ্ড ও আমেরিকার যন্ত্রশিল্প-প্রধান শহরগুলিতে আমরা সেই ধরনের সভ্যতার অস্তিত্ব দেখেছি, যেখানে সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের ব্যবধানটা চিরকালই অব্যাহত।

চারুশিল্পের নমুনা বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি এলগিন মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ ঘোড়সওয়ার, সিসিলীয় সমুদ্রের তীরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভাস্বর গ্রীক উপাসনাগৃহ, শেলীর কবিতা অথবা শুবার্টের কোয়ার্টেট। এদের সুষমাকে, এদের সৌন্দর্যকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। এরা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় না, রুটি সেঁকে দেয় না বটে কিন্তু তারা মনের চোখের খিদে মেটায়। এরা ইন্দ্রিয়-বিচারকে ক্রিয়াশীল করে তোলে; কল্পনা সুখানুভূতির আবেগে আবিষ্ট হয়ে ওঠে, মন আনন্দরসে অবগাহন করে। এই সব শিল্পকর্মকে 'ভালো' বলা হয়েছে এরা কোন প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে বলে নয়; এরা ভালো কেন না এরা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এদের মূল্য এদের রঙে, এদের রূপে, এদের শব্দসংগতিতে এবং এদের ব্যঞ্জনায়।

যন্ত্রযুগের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সামগ্রী উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে শিল্প-সৃষ্টির আঙ্গিকের প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেকটী শিল্পকর্ম শিল্পীর সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে, হয়তো শিল্পী আপনার নাম জাহির করে

না কিন্তু শিল্পী আপন অদ্বিতীয় শিল্প প্রকৃতিটুকুর ছাপ, তার অসামান্য সৃষ্টিগুণের ব্যঞ্জনাটুকু রেখে যান আপনার শিল্পকর্মে। আর এরই গুণে এক শিল্পীর শিল্পকর্মে অন্য এক শিল্পীর শিল্পকর্ম থেকে আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এরই গুণে চারুশিল্প কারুশিল্প থেকে পৃথক বলে স্বীকৃত হয়।

শ্রমশিল্পজাত ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের আশু প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়, তার ফল তাৎক্ষণিক; কিন্তু শিল্পকলায় আমাদের যে ধরনের অভিলাষ পূর্ণ হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। অলিভ পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে গ্রীক স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে গিরগেন্টির যে সব উপাসনা-গৃহগুলি বিরাজ করছে তার স্থাপত্য-কৌশল ও ভাস্কর্য-সুষমার অনুপম প্রশান্ত আবেদনটুকু রসিকচিত্তে যে আনন্দের সঞ্চার করে তা উপভোগ করতে হলে গ্রীক-ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকার প্রয়োজন নেই; গ্রীক দেবদেবীকে স্বীকার বা অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মোজার্টের সোনাটা শুনে আমার কী ভালো হবে, এ প্রশ্ন কেউ করে না। শ্রোতা সঙ্গীতের রসধারায় স্নানপান করে শুদ্ধীভূত হয়, ধন্য হয়।

শ্রমজাতশিল্প (Industrial Arts) সম্বন্ধে এ কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় যে এ তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটুকু যথাযথভাবে পালন করছে কিনা। যেমন, সেতু যখন নির্মাণ করা হয় তখন সেই সেতুর কাজ হল নদী পারাপারের নিরাপদ পথ করে দেওয়া—তেমনি জাহাজ তৈরী করা হয় বিঘ্ন বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে সমুদ্র পার হবার জন্য, কাপড়জামার প্রয়োজন শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। পৃথিবীতে অবশ্য এমন সময় ছিল যখন সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের বিভেদটুকু খুব উগ্র হয়ে দেখা দেয়নি। আমাদের যুগে এমন ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি যে এই প্রভেদটুকু ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে। সারা ইয়োরোপে আমরা অন্তত:পক্ষে গোটা ছয়েক জাদুঘরের কথা জানি যেখানে প্রাচীন গ্রীকদের নিত্যব্যবহার্য চামচ, চিরুণী, পাত্র, আত্মরক্ষাচ্ছদ, ফুলদানি প্রভৃতি সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব জিনিষ নির্মাণ করা হয়েছিল তৎকালীন মানুষের আশু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। কিন্তু আধুনিক মানুষের চোখে তাদের অলংকরণটুকু, শিল্পকর্মটুকুই মূল্যবান; তাদের প্রয়োজনীয়তাটুকু, ব্যবহারিক মূল্যটুকু আধুনিকের চোখে 'এহ বাহ্য'। গ্রীকেরা যে সব সামগ্রীকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য,

ব্যবহার করার জন্য নির্মাণ করেছিলেন আমরা সেই সব সামগ্রীকে শুধুমাত্র 'সুন্দর' বলে গণ্য করছি।

রেনেসাঁ যুগের যে সব প্রসিদ্ধ উপাসনাগৃহ, রাজপ্রাসাদ ও শাসনাধিকরণ-গৃহ একদিন জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল আজ আমরা তাকে শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করছি। মধ্য যুগে যে সব চার্চ বা উপাসনাগৃহ নির্মিত হয়েছিল তাদের শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য হলেও উপাসনাগৃহ হিসেবে তাদের ব্যবহারিক মূল্যকেও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই। Chartres-এর উপাসনাগৃহের রঙীন কাচের জানলার বর্ণ-সমারোহ সেই ধর্মস্থানের ঐশ্বর্যকে বৃদ্ধি করেছে বলে অনেকে মনে করেন, অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পকর্ম লাঞ্ছিত তোরণদ্বারে কত না কোমল শিল্প-ঐশ্বর্যের ব্যঞ্জনা! আধুনিক মানুষের চোখে এই মধ্যযুগীয় শিল্পকলা মহিমামণ্ডিত, তার কারণ এই সব শিল্পকর্মের মধ্যে যে সেই যুগের সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছে। আজকের ভবঘুরের চোখে যা রমণীয় বলে প্রতিভাত হয়েছে তা একসময়ে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকু মিটিয়েছিল মাত্র। আজকের দিনের সংশয়-বাদীর চোখে যা শিল্পোৎকর্ষের চরম নিদর্শন তা-ই একদিন বিশ্বাসপ্রবণ মধ্যযুগীয় মানুষের কাছে ধর্মীয় জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণ বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল মাত্র।

এই ধরনের শিল্প-নিদর্শন দেখে আমাদের এ কথা মনে হয় যে সুস্থ শিল্পের মধ্যে উপায় এবং উপেয়, সুন্দর এবং সৌন্দর্য সাধনার কৌশলটুকু একই সঙ্গে বিধৃত হয়ে থাকে। স্থাপত্য কলার মত শিল্পকর্মে কখনই বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যটুকু চরম ও পরম মূল্য হিসেবে গৃহীত হবে না। বাসগৃহ নির্মাণ ব্যয়বহুল, তাই শুধুমাত্র অলংকরণ-সমৃদ্ধ স্তূপে বাসগৃহকে পরিণত করা যায় না। মানুষের কোন না কোন প্রয়োজনে তাকে লাগানো হবে এবং এই প্রয়োজন সে যতটুকু সিদ্ধ করবে, তার সৌন্দর্য-মূল্যও সেই অনুপাতে স্থিরীকৃত হবে। উপাসনাগৃহ, বন্দীশালা, বিদ্যামন্দির এ সবেরই আপন আপন রূপ অংশতঃ নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আমাদের কালে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায়োজনিকের সঙ্গে সুন্দরের প্রভেদ করা হয়ে থাকে, উনবিংশ শতাব্দীতে 'শিল্পের জন্যই শিল্প' আন্দোলনকে আমরা এই প্রভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে গণ্য করতে পারি। শ্রমশিল্পকে

কেন্দ্র করে যে সব শিল্পনগরী গড়ে উঠছিল, যে বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তাধারা জন্ম গ্রহণ করছিল ধীরে ধীরে তা আমাদের জীবন এবং জগৎ থেকে দিচ্ছিল অধ্যাত্মমূল্য ও তদ্‌জাত রঙ এবং ঐশ্বর্যকে নির্বাসন। এর বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ রূপে 'শিল্পের জন্যই শিল্প' আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা বললেন যে শিল্পের নৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবহারগত কোন দায়িত্ব পালনেরই কথা নয়। সঙ্গীতে সুষ্ঠু শব্দ-প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা পরিশীলিত রূপসৃষ্টির মধ্যস্থতায় সুখবাদী যে ক্ষণিক আনন্দটুকু লাভ করেন সে আনন্দ-সকল প্রয়োজনের অতীত, সে আনন্দে উদ্দেশ্যবিমুখতা অতিপ্রকট। যে জীবনে দায়িত্ব আছে অথচ আনন্দ নেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে সুন্দরের দায়িত্বহীন উদ্দেশ্যবিমুখ সাধনার কথা ঘোষিত হল। শিল্পরূপ-সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিমুক্ত আত্মা তার আপন চিত্রের প্রসন্নতাটুকু খুঁজে পায়। যে সভ্যতার আওতায় সে বাস করে সেই বিকৃত সভ্যতা তাকে সেই প্রসন্নতাটুকু দেয় না। সে যে বিশ্বজগতের অধিবাসী, সেই নিরর্থক জগতের মধ্যেও সেই প্রসন্নতাটুকুর একান্ত অভাব।

এই প্রায়োজনিক এবং শৈল্পিকের মধ্যে যে প্রভেদ করা হয় তার পরিণতি অনুধাবন করা খুব শক্ত নয়। এর ফলে একদিকে ব্যবহারিক সভ্যতা জন্ম নেয়; এই সভ্যতায় থাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতি বা কল্পনাজাত আনন্দের অভাব। এল্‌ পি জ্যাকস্‌ কথিত পুরাকাহিনীতে স্মোক ওভারের দেশের যে গল্প আছে তদ্রূপ অবস্থার উদ্ভব হয়। অন্যদিকে আবার সৌন্দর্যবিলাসীর ছোট ছোট শিল্পকর্মকে ঘিরে ঘিরে নিরন্তর সৌন্দর্যবিলাস ও তজ্জনিত বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের আস্বাদনটুকু তার চারপাশের জীবন ও জগত থেকে একান্তরূপে বিচ্ছিন্ন। মহামনীষী টলস্টয় এই সব সৌখীন শিল্পরসিকদের ঘৃণা করেছেন। আন্তরিকভাবে, নিন্দা করেছেন তাদের সৌন্দর্যবিলাসকে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'What is Art'-এর সবটুকু জুড়ে। অর্থবিহীন শব্দের যোজনায় সংগতিহীন সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে বার বার উনবিংশ শতাব্দীতে, গতানুগতিক, আপাতঃ-রোম্যান্টিক সূক্ষ্মানুভূতি নিয়ে শিল্পের যে রূপৈশ্বর্য সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন শিল্পীরা তা এক একটি ক্ষুদ্র শিল্পী গোষ্ঠীর স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়াস বলে ধরা যেতে পারে, একটি সুস্থ ও স্বস্থ সভ্যতার আন্তরিক প্রকাশ হিসেবে তাদের গণ্য করা যায় না।

সভ্যতার আদি প্রত্যুষকাল থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য রীতি পদ্ধতির বিকার হিসেবে শিল্পকে দেখা হয়েছে বলেই শিল্প সম্বন্ধে একটা নিন্দাসূচক মনোভাব দেখা গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। নীতিবাগীশের দল শিল্প সম্বন্ধে অত্যন্ত কটু মন্তব্য করেছেন; মনুষ্য-জীবনের বিশৃঙ্খলা ও দুঃখকষ্ট নিরাকরণের জন্য যাঁরা সদা সচেষ্ট তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটা থেকে পলায়ন করার নামই হল শিল্প; তাঁদের চোখে শিল্পের কাজ হল আমাদের ইন্দ্রিয়-পথে চেতনার বিক্ষোভ সৃষ্টি করা। দার্শনিকদের মধ্যে কবিসুলভ মনন-সাধনার অগ্রচারী মহাদার্শনিক প্লেতো নৈতিক আদর্শগত প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কবি তথা চিত্রী ও গায়কদের নিন্দা করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। মানুষের চিন্তা এবং কর্মের সর্বজনস্বীকৃত শৃঙ্খলাটুকুকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে এই চারুশিল্প। জীবনের বাস্তব সত্যটুকু থেকে কবির স্বপ্ন মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে পারে। এই সব অভিযোগ নীতিবাগীশদের মুখে আমরা শুনেছি প্লেতো-পরবর্তী যুগ থেকে। এঁরা আরো বললেন যে সঙ্গীতের নরম সুর শুনে শুনে মানুষের বীরত্বে, তার যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তিতে মন্দা পড়তে পারে। ছবিতে অনুকৃতির অভাবিত রূপ দেখে মানুষের মনকে বাস্তব সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সেণ্ট অগাস্টিন প্রমুখ অন্যান্য নীতিবাগীশের দল শিল্পের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিকে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিল্প মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তুলতে পারে। নন্দনতাত্ত্বিকদের মতই নীতিবাগিশের দলও শিল্পের ইন্দ্রিয়গত আবেদন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন; বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটুকু মানুষের মনোযোগ এবং কল্পনাশক্তিকে আকৃষ্ট করে। মানুষ তার পার্থিব পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়; বিশ্বজগতের স্রষ্টার মহিমা মানুষ বিস্মৃত হতে বসে। এ কথা বললেন সেণ্ট অগাস্টিন। ইন্দ্রিয়গোচরতা ও ইন্দ্রিয়ের বশ হওয়া এ দুটোর মধ্যে খুব একটা বিশেষ পার্থক্য নেই। রঙ এবং রূপের জন্য আমাদের যে মোহ তা থেকে উক্ত মোহের রঙ এবং রূপকে পৃথক করা খুব সহজসাধ্য নয়। সুন্দরের আবেদনে যখন মানুষের নিম্নতর সত্তা সাড়া দেয়, তখন মানুষ অসঙ্গ অচেতন সৌন্দর্য-বস্তুতে তার আগ্রহটুকু সীমাবদ্ধ করে না-ও রাখতে পারে। মহাদার্শনিক প্লেতো, মনীষী টলস্টয় এঁরা আশঙ্কা করেছেন যে ইন্দ্রিয় যখন একবার জাগ্রত হয় তখন তা মানুষকে অবনতির গভীরে যে কোন মুহূর্তে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় দর্শন-

বেত্তারা দর্শনকে ধর্মের অনুচারী বলে যেমন গ্রহণ করেছিলেন তেমনি তাঁদের মতে শিল্পকলা শয়তানের সহচর বলে পরিগণিত হয়েছিল। যে সুন্দরের আবেদন ইন্দ্রিয়ের পথে আসে তা মানুষের আত্মার সর্বনাশ সাধন করে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে চারুশিল্পের যে নিন্দা করা হয় তার খানিকটা তবু বোধগম্য। মানুষের উত্তেজনাগ্রস্ত, সম্মোহিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের শক্তি সম্বন্ধে নীতিবাগীশের দল যে স্তুতি গেয়েছেন তা একান্তই অনিচ্ছা-প্রসূত। মনঃসমীক্ষা যৌনশক্তির সর্বাত্মক আবেদনের সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার অনেক আগে খ্রীষ্টান নীতিবাগীশেরা অনুভব করেছিলেন কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের কাজে যৌন আকাঙ্ক্ষা আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। ইন্দ্রিয়-চেতনা ধীরেধীরে যৌনচেতনার উজ্জীবন ঘটায়। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার যে সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রূপ আমাদের চোখ ধাঁধায় তার অনেকখানিই যৌনজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শিল্পের ডায়োনিজীয় রূপে যে উন্মাদনা, যে আবেগমুক্তির নিশানা, তার অনেকখানিই যৌন প্রকৃতিগত।

সুতরাং নীতিবাগীশেরা যে যে কারণে শিল্পের নিন্দা করেন তার অনেক-গুলিই সম্ভাব্য এবং যথার্থ। কিন্তু তাঁরা এই থেকে যে সব সিদ্ধান্ত করেন তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যাঁরা আপন আপন অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান এবং তার সকল সম্ভাব্যতা এই জীবনেই আস্বাদন করতে চান তাঁদের কাছে শিল্পের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ অর্থহীন বলে মনে হয়। শিল্পের ইন্দ্রিয়-গোচরতায় তার ইন্দ্রিয়গত আবেদনের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য খুব বেশি জোরদার বলে অনুমিত হয় না। মেসফিল্ড স্থানান্তরে বলেছেন যে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, এই সত্যটুকু জানি। কী পেয়েছি এবং আমরা কী নষ্ট করেছি তা জানি না। ছবি ও গান আমাদের অন্তরূপসমৃদ্ধ বহুমুখী অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের অধিকতর সচেতন করে। এর ফলে আমরা আরো সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠি। যে সভ্যতায় শৃঙ্খলা রয়েছে তার প্রচেষ্টা যদি হয় আমাদের জীবনকে দীর্ঘায়িত করা, তা হলে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সেই সুশৃঙ্খল সভ্যতার অন্যতম প্রচেষ্টা হবে জীবনকে বিচিত্রতর করে তোলা, জীবনের কুক্ষিটুকু প্রাণের গুণৈশ্বর্যে ভরে দেওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গত চেতনার অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমগ্র সত্তার মৃত্যুও আসন্ন হয়ে ওঠে।

আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনা স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র চেতন জীবনও স্তিমিত হয়ে পড়ে, আমাদের সমগ্র সত্তা নিষ্প্রভ হয়ে আসে। অধ্যাত্ম চেতনার উন্মার্গ-গমন সেই সব মানুষের মধ্যে সহজে চোখে পড়ে যাঁদের ইন্দ্রিয় শক্তি তীক্ষ্ণ ও সতেজ; যাঁদের চোখ রঙ দেখে না। তাঁদের অধ্যাত্মচেতনার উধ্বর্-গমনেও বাধা পড়ে।

টলস্টয়ের লেখায় আমরা পড়েছি যে শিল্প শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তি সমূহের কণ্ডুয়ন করে। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে, জোরদার ভঙ্গীতে, আপোষহীন কণ্ঠে এই অভিযোগ জানালেন। কিন্তু শিল্পের বিষয়বস্তু অংশত যৌনজীবনগত হওয়ার জন্য এবং তার আবেদন কিছু পরিমাণে যৌনজীবনাশ্রয়ী বলে তাকে ভয় করার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলে এ যুগের মানুষেরা মনে করে না। আধুনিক কালে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যৌনজিজ্ঞাসাকে সন্দেহের চোখে দেখে না। তাকে ভীতির কারণ বলেও গণ্য করে না। অধিকাংশ নীতি সংস্থার লক্ষ্য হল আমাদের আবেগ, মায়ামমতা ও আমাদের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ; এই বিশুদ্ধিকরণ-প্রক্রিয়ার শুরু হয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথেই। আর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার শুদ্ধিটুকুই শিল্পকলার কাছে প্রাথমিক কাম্য বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

শিল্পের বিরুদ্ধে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর আপত্তিও উত্থাপিত হয়েছে। গোঁড়া বিশুদ্ধবাদীর (Puritan) দল চিরাচরিত নৈতিক আদর্শের ধুয়ো তুলেছে, রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা রাষ্ট্রনীতির খাতিরেও বিপদের আশংকা করে আপত্তি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রের কর্তারা সমাজে শৃঙ্খলা রাখতে চান, অন্ততঃপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে। শিল্পের অন্যতম ধর্ম হল এই যে শিল্প শিল্পরসিককে শেখায় জীবন এবং জগতকে সম্পূর্ণ নতুন অভাবিত রূপ-কল্পনার মধ্যে দিয়ে দেখতে। গোঁড়া বিশুদ্ধবাদীরা এতে আপত্তি জানায় কেন না, এক্ষেত্রে আবেদনটুকু হল ইন্দ্রিয়গত আবেদন। রাষ্ট্রকর্তা আপত্তি করেন চারুশিল্পে কল্পনাশক্তির বিস্তার সাধিত হয় বলে। কবির কল্পনা এমন সব বস্তুর আবিষ্কার করেন যা কখন জলে স্থলে কোথাও কেউ দেখে নি। বস্তুজগতে যাদের দেখা পাওয়া যায় তাদের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর এই কবি-কল্পনার জগত। কবি হলেন জন্ম থেকেই বিপ্লববাদী; মহাদার্শনিক প্লেটো এই মহাসত্যটুকুকে সর্বপ্রথমে উপলব্ধি

করেছিলেন। লণ্ডন শহরের বস্তির জীবন অথবা শহরের উপকণ্ঠে শহরতলীর মানুষের জীবনের সঙ্গে মহাকবি শেলী-কল্পিত সুশৃঙ্খল সৌন্দর্যমণ্ডিত আলোঝলমল জীবনপ্রবাহের কী তুলনা করা যায়? মহাকবি মিল্টন তাঁর বিখ্যাত কাব্যকথার প্রারম্ভে বললেন যে তিনি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিচারশীলতার ন্যায়নিষ্ঠাটুকু সকলকে প্রত্যক্ষ করাবেন কিন্তু উপসংহারে তিনি এমন সব জটিল প্রশ্নের অবতারণা করলেন যার ফলে আমাদের সহানুভূতি শয়তানের দিকে প্রধাবিত হয়! শিল্পের আবার প্রচারের একটা দিক আছে; Uncle Tom's Cabin-এর মত সদ্‌গ্রন্থ এমন একটা বেগবান আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারে। হয়ত একটা পরাধীন জাতকে অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দেবে। কী ভাবে কখন যে শিল্পী তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে একটা জাতির আবেগকে কল্পনার স্পর্শে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারবে, তার ভয়ে রাষ্ট্রকর্তা সদা ভয়গ্রস্ত। কেন না এই উদ্দীপ্ত আবেগই চিরাচরিত অভ্যাসের সুদৃঢ় স্তম্ভগুলিকে ধূলিসাৎ করে দেয়, শুভবুদ্ধিজাত শৃঙ্খলাবোধ অথবা সুপ্রাচীন সংস্থাগুলির নীতি-শৃঙ্খলকে হঠাৎ শিথিল করে তোলে। রাষ্ট্রকর্তা তার আইনের বেড়া ভেঙ্গে যাবে বলে সঙ্গীতমুখর কবিকে, আবেগময় নাট্যকারকে বড় ভয় করেন। সভ্যতার ইতিহাসে সমীক্ষকের বরাবর আবির্ভাব হয়েছে, সে এসেছে নিষেধের দণ্ড তুলে শিল্পীকে শাসন করতে; কেননা শিল্প শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক নয়। তা থেকে রাষ্ট্রনৈতিক বিপদেরও সূচনা হতে পারে।

শিল্পী যখন শুধুমাত্র আপন-গন্ধে বিহ্বল কস্তুরী মৃগ মাত্র নয়, তখন সে তার শিল্পকর্মের আত্যন্তিক নৈতিক শক্তিটুকুকে, তার কল্পনাশক্তির কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে না। প্লেটো শিল্পের এই শক্তিটুকুকে এই কার্যকারিতাটুকুকে স্বীকার করেছিলেন বলে তিনি কেবল সেই কাহিনীগুলিই কবিদের বলতে বললেন, সেই গানগুলিই গায়কদের গাইতে বললেন, যা তাঁর পরিকল্পিত 'শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র' স্থাপনের অনুকূল। কবি শেলী কাজের স্বপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগমুখর ভাষায় বললেন যে কাব্য হল মনুষ্যসমাজের আইন-প্রণেতা; যদিও সর্বজনস্বীকৃতির মর্যাদা সে পায় নি। কাব্য মানুষকে বিচলিত করে; তবুও কাব্যে নির্দেশ থাকে না, ন্যায় শাস্ত্রের পৌর্বাপর্য নেই সেখানে, বুদ্ধিজাত কঠোর শৃঙ্খলাবোধের অভাবও হয়তসে

লোকে পরিলক্ষিত হয়। তাকে রূপকথা, অলীক কল্পনা অথবা রূপকের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। যে চিত্তে মালিন্য অপগত হয়েছে সেই চিত্তে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের ছবি ফুটে ওঠে, তাকে যদি সত্য করে তুলতে হয় তা হলে চারুশিল্প যে সব ছবি, যে সব রূপক নিয়ে কাজ করে তা দিয়েই মানুষের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বেল করে তুলতে হবে। তাদের কর্মশক্তিকে নতুন নতুন পথে উৎসারিত করে দিতে হবে। কবিকল্পনা তাদের সেই সব কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের বিচারশক্তি কখনই যে সব কাজ করতে বলবে না। বিচারশক্তির অনপচয়তার প্রত্যন্ত সম্ভাবনায় শিল্পের নির্দেশনা সুস্পষ্ট রূপে নৈতিক শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে; এই আপাতঃ-অসম্ভব সম্ভব কেন না শিল্পের মধ্যে শিল্পীর কল্পনা শক্তিটুকু থাকার ফলেই শিল্পীর নৈতিক মর্যাদা এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়।

গোঁড়া বিশুদ্ধবাদী শিল্পের নিন্দা করেন কেন না শিল্পের আবেদন হল ইন্দ্রিয়জ; রাজনীতিবিদেরা বারবার শিল্পকলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন কেননা বল্গাছেঁড়া যে স্বপ্ন শিল্পীরা দেখেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আর একটি খুব জোরালো অভিযোগ এসেছে সাধারণ মানুষের তরফ থেকে; তাঁরা মনে করেন যে শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরস আস্বাদন এই উভয়বিধ কাজই হল নিষ্ফল অবকাশ যাপন মাত্র। কাজের মানুষ যাঁরা তাঁরা শিল্পচর্চাকে বাস্তবের কাছ থেকে পলায়ন ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। যাঁরা গোষ্ঠীপতি, যাঁরা শিল্পপতি, যাঁরা সংস্থার অধিকর্তা, এঁরা সকলেই শিল্পীকে সন্দেহের চোখে দেখেন; কেননা শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক; শিল্পরসিকও সন্দেহভাজন কেন না তিনি তাঁর আনন্দময় সংবেদনটুকু ছাড়া অন্য কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করেন না। শুধুমাত্র গতানুগতিকভাবে কাজকর্মটুকু করলেও এই পৃথিবীতে এতো কাজ করার রয়েছে যে তা বলে শেষ করা যায় না; জীবনের এতো রকমের দাবী এবং এতো রকমের উদ্বেগ তার সঙ্গে জড়িত যে খুব কুশলী এবং শক্তিমান মানুষের প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হয়ে আসে জীবন সংগ্রামে। তাই শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পরস আস্বাদন, এই উভয়বিধ কর্মই অত্যন্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। একটি চতুর্দশপদী কবিতা লেখার চেয়ে একটি শিশুর তত্ত্বাবধান করা অনেক বেশী দামী বলে মনে হয়। শিল্পরস

আস্বাদনের ব্যাপারেও বলা যায় যে জগতের অনন্ত বাস্তব দৃশ্যাবলী অনেক বেশী সক্রিয় ও প্রাণবান; ক্যানভাসে আঁকা ছবির চেয়ে সে বাস্তব ছবি অনেক বেশী জীবন্ত, অনেক বেশী বেগবান। সাহিত্যে কথিত যে কোন কাল্পনিক ঘটনা-সন্নিবেশের চেয়ে জীবনের বাস্তব ঘটনার জটিলতা ও আবেগময়তা মানুষকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করে। সাধারণ কাজের মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য এবং সঙ্গীতে আমরা যা কিছু পাই তা হল বাস্তব জীবনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। যদিও উদ্বোধনী ভাষণে এঁরা সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্তুতি করেন, তবু কিন্তু যাঁরা কাজের মানুষ তাঁরা মনে মনে জানেন যে শিল্প হল তুচ্ছ, সেখানে পৌরুষের অভাব রয়ে গেছে।৮

বিরুদ্ধবাদীদের এই ধরনের অভিযোগের সারমর্ম হল এই যে, চারুকলা আমাদের রুটি বানায় না। এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে মানুষ কেবলমাত্র রুটি খেয়ে বাঁচে না। কাজের মানুষ অনুভব করেছেন যে শিল্প শুধুমাত্র একটা জাতির লীলার বহিঃপ্রকাশ। আমরা শিল্পানন্দের আস্বাদন করি সেই আনন্দটুকুই পাবার জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্যমূলকতা এর নেই। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত যে আনন্দ সেইটুকুই আমরা লাভ করি সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকর্মের মাধ্যমে। নীতিবাগীশ সামাজিক অন্যায়ের সংশোধন কর্মে সদাব্যাপৃত। যে সমাজের ব্যবহারে বিকার প্রবেশ করেছে তার নিরাকরণে তিনি সদাযত্নশীল। বাস্তব জগতের বস্তুসম্ভার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে জীবনমানের উন্নয়নই হল কাজের মানুষের লক্ষ্য। তার মনের গহনে যে ছবিটি রয়েছে তাকে বাইরে মেলে ধরবার লীলায় শিল্পী মাতোয়ারা। শিল্পরসিক তার ইন্দ্রিয় ও কল্পনার সামনে যে বিষয়টুকু রয়েছে তাতেই মগ্ন হয়ে আনন্দরসের আস্বাদন করেন।

কাজের মানুষের বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে চারুশিল্পের চেয়ে বেশি নিষ্ফল অন্য কিছুর কথা ভাবাই যায় না। বীটোফেনের সোনাটা রচনার সময় যন্ত্রশিল্পের ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন বিপ্লব ঘটে যায় নি। সোনাটা যাঁরা শুনেছেন তাঁদের প্রকৃতির কোন পরিবর্তনই হয়নি। তাঁরা যে সমাজে বাস করেন তারও কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থান্তর ঘটে নি। শিল্পীর আকস্মিক শিল্পসৃষ্টি-কর্ম ঠিক ব্যবহারিক জীবনধারার কর্মকুশলতার মধ্যে আপনাকে মানিয়ে নিতে পারে না। শিল্পরসিক যে সময়ে রসের আস্বাদন করেন,

সেই সময়টুকুতে তিনি জগতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন।

কিন্তু এই গুরুত্বের প্রশ্নে গোঁড়া বিশুদ্ধবাদী এবং কাজের মানুষের বোধ হয় কোন ভ্রান্তি ঘটেছে। কেন না বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্প-রসাস্বাদন কর্ম হল সেই নৈতিক জীবনধারারই প্রতীক, যে ভালো জীবনের প্রস্তুতির জন্যই নীতিবিদ সদা ব্যগ্র ; আর এই নীতি-আশ্রয়ী জীবনায়নই কাজের মানুষের ও সমগ্র ব্যবহারিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

এ তত্ত্ব নিরন্তর প্রচার করা হয়েছে যে, যে সমাজে ব্যক্তি-মানুষ পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে সেখানে সব কথার কচকচি অবান্তর অতিরিক্ত। পৃথিবী যদি স্বর্গ হতো, যদি সেখানে চাইবার আগেই সব কিছু পাওয়া যেতো, তা হলে যন্ত্রশিল্প বা ব্যবহারিক জীবনরীতির কোন প্রয়োজনই থাকত না। আমরা অশুভের মধ্যে, অমঙ্গলের মধ্যে বাস করি বলেই মঙ্গলের দিকে, কল্যাণের দিকে আমাদের একটা ঝোঁক আছে। আমরা ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলি করি তার কারণ আমরা এমন একটা পরিবেশে জন্মাই যে পরিবেশটুকু ঠিক আমাদের জন্য সৃষ্টি হয়নি ; আমরা এই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বড় হই। হোরেস এম্ ক্যালেন উপরোক্ত মতের অনুরূপ মত প্রচার করেছেন। যদি আমাদের জীবনের স্থূল দ্বন্দ্বগুলোর অনায়াস নিষ্পত্তি ঘটে, তা হলে জীবনের কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে ? জীবনের স্থূল দ্বন্দ্বগুলোর মতই প্রয়োজনগুলোও যদি মিটিয়ে ফেলা যায়, তা হলে জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে কী ? বিশৃঙ্খল সমাজের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের আত্মা কী করে আপনাকে ফিরে পাবে ? যখন সে তার বস্তু-জীবনের সর্বগ্রাসী সংঘাত থেকে মুক্তি পায় তখন তার আত্মোপলব্ধির জন্য আত্ম-বিকাশের জন্য সে কী করবে ? যেখানে অবকাশ আছে, সেখানে এই প্রশ্নের সমাধানও রয়েছে। মানুষ সে কাজকে যথার্থ মূল্যবান মনে করে, যে কাজে সে আনন্দ পায়, তা সে তার এই অবকাশের মুহূর্তে সম্পাদন করতে ভালোবাসে। সৎ আচরণ ও সৎ জীবন সম্বন্ধে নীতিবাগিশেরা এতো কথা বলেন অথচ সেগুলিকে কাজে ফুটিয়ে তু .তে তাদের কোন মাথা-ব্যথাই নেই। এই সৎ-জীবনের মধ্যে মনুষ্য-জীবনের সকল সম্ভাবনাই বিধৃত। ইন্দ্রিয়জ সূক্ষ্ম আনন্দানুভূতি, আবেগের প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনসিদ্ধি এবং এতদুভয়ের

সমন্বয়, মুক্ত চিন্তনক্রিয়াজাত আনন্দ, এ সবই হল ভাগ্যবান মানুষের পরম সাধনার বস্তু। তাঁর জীবনে এদের আবির্ভাব ঘটে এবং অতীতেও ঘটেছে। মানুষ তার সংবেদনশীল সত্তার সমগ্রতাটুকু মাত্র নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে আমরা কখন সক্রিয় আবার কখন বা নিষ্ক্রিয়। যেখানে কিছুই করার নেই সেখানে আমরা কিছু না কিছু করার চেষ্টা করি। তারা তাঁদের শক্তি সামর্থ্যের সীমা লঙ্ঘন না করে যা কিছুই করুন না কেন তার দ্বারা একধরনের শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হয়। তাঁদের কাছে যে কোন ধরনের বস্তুই থাকুক না কেন তারা তাঁদের কণ্ঠস্বর, তাঁদের হাত, তাঁদের মনকে সেই বস্তুগুলি নিয়ে খেলা করতে প্রেরণা দেবে। তার ফলে পিয়ানোবাদকের হাত পিয়ানো বাজিয়ে সুরসৃষ্টি করে। তাঁদের জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে ; তাঁরা মুক্ত জীবনের অধিকারী হবেন। এই মুক্তি হল কোন প্রত্যন্ত উদ্দেশ্যের হাত থেকে মুক্তিলাভ। আপন আপন জীবনে শৃঙ্খলাবোধটুকু আসবে আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে।

নন্দনতাত্ত্বিক রসের আস্বাদন এবং শিল্প-সৃষ্টি কর্ম এদের দুটিকে আমাদের সভ্যসমাজের কাঠামোর মধ্যে সৎ-জীবনের অগ্রচারী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। আমাদের সমকালীন মানুষদের যে ধরনের আনন্দের আস্বাদন করতে দেখা যায়, ঠিক সেই ধরনের আনন্দের অনুভূতি তাঁরা পান, যাঁরা আপন আপন কর্তব্য কর্ম আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করতে পারেন। দান্তের মহাকাব্য লেখার সময় ভগবান এবং কল্যাণকর্মের মধ্যে কোন পার্থক্যই করেনি তাঁর কবি-দৃষ্টি। এমন কী দেবদূতদেরও তিনি কোন কোন কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। যে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজের কল্পনা তিনি করেছেন সেটা জাদুঘরে রাখা রসিক মানুষের সম্মিলন মাত্র নয়। সে সমাজে শিল্পীরা আপন আপন সৃষ্টিকর্মে নিরন্তর আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক সভ্যতায় শিল্পের কাজ হল শিল্পদর্শককে বস্তু-জগতের হাত থেকে ক্ষণিক মুক্তিলাভে সহায়তা করে ; শিল্পী আপনার সৃষ্টিকর্মে নিমগ্নচিত্ত হয়ে থাকে। যে সমাজে মানুষের বিচারশক্তিকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে, সেই সমাজের সকল কর্মেই শিল্পের ব্যঞ্জনাটুকু থেকে যায়। সেই সমাজের সকল আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যেই নন্দন-তাত্ত্বিক রসের আস্বাদনের আভাস এসে লাগে।

শিল্পের ব্যবহারগত মূল্য নেই, তা একেবারেই অসংলগ্ন, এই ধরনের সব উক্তি একেবারেই অযৌক্তিক। কাজ এবং খেলার মধ্যে আমরা যে পার্থক্য

করে থাকি তা আমাদের অসংলগ্ন সমাজ-জীবনের দ্যোতক; আমাদের অপরিচ্ছন্ন চিন্তার ফল বলেও একে বলা যেতে পারে। বস্তুর শাশ্বত প্রকৃতির মধ্যে এই ধরনের কোন ভেদ করা যায় না। আমাদের সভ্য জীবনের কাজে কর্মে আনন্দের কত অভাব, এই প্রভেদটুকু তা সরবে ঘোষণা করছে। আরো বলছে যে আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক রসের আস্বাদনকর্মটুকু একান্তভাবেই অসংলগ্ন এবং তুচ্ছ। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের দুঃখের বোঝা যদিও অনেক বেশি দুঃসহ ছিল তবুও কারিগরেরা আপন আপন রূপসৃষ্টির কর্মের মধ্য দিয়ে পেয়েছে আনন্দের আস্বাদন। আজকের মত যন্ত্রচালনরত সামান্য একটা সংখ্যায় তারা পর্যবসিত হয়নি। অতীতকালে গ্রীস দেশের মানুষেরা আনন্দের জন্যই আনন্দটুকু আহরণ করত; কোন ভবিষ্যতের ভরসায় বর্তমান জীবনের আনন্দকে উপেক্ষা করত না।

শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ, রসিকের শিল্পরসের আস্বাদনজাত পুলকটুকু আমাদের সেই মহৎ সত্যটুকুর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলছে যে সুস্থ এবং স্বচ্ছ সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের আনন্দরসের আস্বাদন সম্ভব হবে সমাজব্যবস্থার ক্রমোন্নতির জন্য। আজকে আমরা যাকে 'কাজ' বলি, তার চেয়েও ব্যাপকতর অর্থে 'কাজ'কে যদি আমরা গ্রহণ করি তবে তাকে 'চারুশিল্প' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যে সব বস্তুর সৃষ্টিতে আনন্দ পাওয়া যায় সেই সৃষ্টিকর্মের

একধরনের সৃজনী শক্তি বিরাজমান, এই সৃষ্টিশক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্ম-নিয়োগের মাধ্যমে যে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তা প্রীতিপ্রদ, তা আনন্দদায়ক। এ ক্ষেত্রে খেলা এবং কাজের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির খেলাকে আর 'তুচ্ছ' বলে ভাববার অবকাশটুকু থাকে না। সৌখীন শিল্প-রসিকের নিরাসক্ত আনন্দানুভূতির এ পরিবর্তন ঘটে। কবিতা, ছবি এবং গানে আর শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সৌখীন শিল্পরসিকের অধিকারটুকু থাকবে না। দেশের বুদ্ধিজীবিরা বৃহত্তর জনসমাজের অধিকার সূক্ষ্ম শিল্প-রসের আস্বাদন ব্যাপারে স্বীকৃত হবে। সভ্যতার মূল্যটুকু মাপা হবে চারুশিল্পের কষ্টিপাথরে বিচার করে; সভ্যজীবনের অঙ্গ হিসেবে যে সব কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বীকার করা হয়ে থাকে তারা কী পরিমাণে নন্দনতাত্ত্বিক গুণৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান, তার উপরে সভ্যতার মূল্যায়নটুকু নির্ভর করবে। সভ্য মানুষের আনন্দে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দরসের প্রশান্তিটুকু যদি খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে সে সভ্যতার যে যথার্থ

মূল্য আছে, এই সত্যটুকুকে স্বীকার করতে হবে। কালক্রমে শিল্পীর পরিশীলিত স্বাধীনতার ধারণাটুকুকে সর্বোচ্চনীতি বলে স্বীকার করা হতে পারে। শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরসের আস্বাদনকে পরম যৌক্তিক ও বুদ্ধি-আশ্রয়ী বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এ যখন সম্ভব হবে তখন জীবনশিল্পকে চারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে গণনা করতে হবে। এই ধরনের সমাজে রাষ্ট্রনীতি-বিদেরা মুখ্য শিল্পীর সম্মান লাভ করবে।

সভ্যতার পরিবর্ধনে শিল্পের কী কাজ, এটা আমাদের বুঝতে হবে। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় পরাতাত্ত্বিক কোন সত্য উদ্ঘাটিত হয় কী না, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। বস্তু-জগতের অন্তরে কোন সারবত্তা রয়েছে কী না, সত্য বলতে আমরা কী বুঝি এই সব জিজ্ঞাসা নিয়ে দার্শনিকেরা মেতে রয়েছেন হাজার হাজার বছর ধরে। সত্যের অনুসন্ধান কার্যকে মানুষের অন্যতম মহৎ-কৃতি বলে সাধুবাদ দেওয়া হয়েছে ; মানুষ নিরাসক্ত চিত্তে সত্যানুসন্ধান কর্মে আত্ম-নিয়োগ করেছে। বাস্তব জগতের অন্তরালে যে সত্তা রয়েছে মানুষ তাকে খুঁজে ফিরেছে। এই সত্যানুসন্ধান কর্ম তর্কশাস্ত্র-অন্বিষ্ট। বস্তু-জগতের অন্তরতম সত্তাটুকুর অনুষ্ঠানকর্মকে নন্দনতাত্ত্বিক কৃতি বললেও বলা যায়। সত্য কোন ঘটনা সম্বন্ধে বিবৃতিমাত্র ; আর ঘটনা হল সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লব্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্ত ; চারুশিল্প এই ইন্দ্রিয়োপাত্তকে অনেক বেশি পরিষ্কার করে, উজ্জ্বল করে পরিস্রুত করে তাকে রসিকজনের দরবারে হাজির করে ; এর ফলে এদের সত্তা মহত্তর মর্যাদায় ভূষিত হয়। আলস্য, স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব, এরাই বস্তুর সত্যটুকুকে দেখার পরিপন্থী। আমরা যে জগতে বাস করি তার সব কিছুই অস্পষ্ট, শিল্পী তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে, ছবির মধ্য দিয়ে, রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের চোখ কান খুলে দেন, আমাদের কল্পনাশক্তিকে উর্বর করে তোলেন ; এই অস্পষ্ট বস্তুজগতে আমরা স্পষ্ট করে সত্যটুকুকে দেখতে পাই। খোলা চোখে আমরা বস্তুর অন্তরে যেটুকু সত্য দেখতে পাই, ছবির মধ্যে তার চেয়ে অনেক পরিষ্কারভাবে সত্যের রূপটুকু অবলোকন করে থাকি। দৈনন্দিন জীবনে যে সব মানুষের সংস্পর্শে আসি, তাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ থেকে যাই ; আর উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রকে অনেক সহজে বুঝি কেন না তা অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং বুদ্ধি-গ্রাহ্য। সত্যকে অনুধাবন করতে হলে পরাবিদ্যাগত কোন বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মধ্যে তাকে পাওয়া শক্ত ;

শিল্প-কর্মের অবিসংবাদিত সত্তার মধ্যে সেই সত্যটুকুকে অন্বেষণ করতে হবে।

দার্শনিক বের্গ্‌সঁ এই সত্যটুকুকে জেনেছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে দার্শনিকের বিশ্লেষণের চেয়ে কবির সংজ্ঞা অনেক সহজে সত্যের অন্তরে প্রবেশ করে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে। ক্রোচে এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই বললেন যে শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টি-কর্মটুকু একটি কথায় ব্যাখ্যা করা যায়; কথাটা হল Intuition বা স্বজ্ঞা। দার্শনিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় পাতার পর পাতা জুড়ে মানুষের অমৃতত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু তা ততটা বোধগম্য হবে না যতটা বোধগম্য হবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার কয়েকটি চরণ পাঠ করে অথবা প্লেটো-কথিত কোন রূপকথা শুনে। সিজানের আঁকা তুষারাবৃত একটি গাছের ছাল আমাদের সজাগ করে তুলবে গাছের সত্তা সম্বন্ধে। এর আগে এমন করে আমরা কখনও একটি গাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতোখানি সচেতন হইনি। আমাদের জানাশোনা হাজারো মেয়ের চেয়ে বেশি পরিচিত মনে হয় আনা কারেনিনাকে। বস্তুকে তার ছায়া থেকে পৃথক করে রাখে যে অসামান্য বৈশিষ্ট্যটুকু তার দেখা আমরা পাই শিল্পের অলৌকিক লোকে।

। ৩ ।

জগত, কথা ও কবি

শিল্পী শিল্পসৃষ্টির জন্য কোন না কোন উপাদান নিয়ে কাজ করেন। তার উপাদান হয় পাথর, না হয় রং আর না হয় কথা। কথা বলার যে শৈলী, যে আঙ্গিকে কবি কথা বলেন তা শিল্পতত্ত্বের এক অতি রহস্যময় সমস্যা। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে ভাষা একটি অতীব প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, বাস্তব অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। শব্দের অর্থ ও তর্কশাস্ত্রসম্মত ব্যঞ্জনাটুকু থেকে ভাষাকে যদি পৃথক করে দেখা হয় তা হলে বলতে হয় যে ভাষা একদিকে যেমন বাতাসের মত লঘু এবং শূন্য, অন্যদিকে আবার তার সারবত্তাও অনস্বীকার্য। ভাষা হল সঙ্গীতের মত স্পন্দমান, তার মতই পলায়নতৎপর। কবির কথার সঙ্গে চিত্রীর রং ও রেখাকে যদি তুলনা করা হয় তা হলে বোঝা যায় যে চিত্রীর শিল্প-মাধ্যম কত বৃহৎ, কত দীর্ঘস্থায়ী। সমস্ত সাহিত্যকে বিশেষ করে কাব্যকে 'বর্ণ সঙ্কর শিল্প' বলা যেতে পারে। এক অর্থে সঙ্গীতের মতই কাব্যের আবেদন তার সুর, তার বিশেষ স্বরগ্রাম; তার নিজস্ব ধ্বনিবিন্যাসকে আশ্রয় করে ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে। কাব্যকে আমরা ভাব আদান-প্রদানের বাহন হিসেবে ভাবতে পারি, শুধু এই বাহনটি ছন্দৈশ্বর্যে মণ্ডিত, অন্যান্য ভাবের বাহনের থেকে তার এইটুকু তফাৎ। সঙ্গীতের মতই কাব্যের মৌল প্রকৃতি হল, তা ভাবের বাহন হলেও অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী এবং তা সহজেই শ্রোতার চিত্ত বিগলিত করে।

কাব্যের এই দ্বিবিধ কার্যকারিতা লক্ষ্যণীয়। একদিকে কাব্য ধ্বনি-সুষমার, ধ্বনি-কৌশলের আশ্রয়, অন্যদিকে আবার তা ভাববিনিময়ের বাহন।

সকল সাহিত্যকেই এই দ্বিবিধ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হয়। ভাষা একাধারে কাজের ভাষা, আবার তা সঙ্গীতেরও ভাষা ; একদিকে যেমন তাতে সুর আছে, অন্যদিকে আবার তার তর্কশাস্ত্রসম্মত রূপও আছে। তাই জন্যই সাহিত্যের দুটি রূপ পরস্পরকে তির্যক ভঙ্গীতে ছুঁয়ে চলে গেছে। তারা হল গদ্য ও পদ্য। আদর্শগতভাবে গদ্য হবে এক ধরনের বীজগণিত, এক বিশেষ ধরনের সঙ্কেত-বার্তা। যে ভাবটুকু বহন করা দরকার তার বাহন হওয়া ছাড়া গদ্যের অন্য কোন কাজ নেই। গদ্য সেই কাজটুকু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় করবে। যা বলতে চাইছি গদ্য শুধু সেইটুকুর প্রতীক হবে, সেইটুকুকেই এমনভাবে প্রকাশ করবে যেন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ না থাকে। বৈজ্ঞানিক সংগঠনেই গদ্যের রূপের পূর্ণতম প্রকাশ। সে হিসাবে শিল্প-পদবাচ্য হওয়ার কোন অধিকার গদ্যের নেই।

কিন্তু শব্দের দুটি দিক আছে ; এবং এই দুটি দিক থাকার ফলেই গদ্যকে শিল্প-বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য গদ্য খুব নির্ভরযোগ্য শিল্পবাহন নয়। খুঁতখুঁতে তর্কবিদ্যাবিশারদ যতই শব্দকে নিখুঁতভাবে শুধুমাত্র অর্থবাহী করার চেষ্টা করুন না কেন, শব্দের মধ্যে আবেগের ব্যঞ্জনা থেকেই যায় ; ভাষায় ছন্দ নিত্য-অনুস্যূত ; বীজগণিতের সূত্রতেও এই ছন্দের সন্ধান মেলে। যে ভাষায় দার্শনিক শিল্পধর্ম-মূলক দর্শন-আলোচনা করেন তার মধ্যেও সেই ভাষার সহজ ছন্দটুকু, ধ্বনি-সুষমাটুকু আপনা থেকেই ফুটে ওঠে। দার্শনিক দেকার্তের দর্শন আলোচনায় ফরাসী ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য সহজভাবেই ফুটে উঠেছে। বের্গসের দর্শনও এই ধ্বনি-ঐশ্বর্যের জন্যই সুখপাঠ্য।

কথা কেবলমাত্র শুষ্ক শব্দ নয়। তার অঙ্গে আবেগের স্পর্শটুকু লেগে থাকে। যে পরিবেশের মধ্যে, যে শিক্ষকের কাছে ভাষা আমরা শিখি, তাদের কথা, তাদের স্মৃতি ঐ ভাষার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ; বাল্য-কালের কত মধুর স্মৃতি ঐ ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ; যে সব পরিবেশে ঐ ভাষা ব্যবহার করেছি, তার স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে ঐ ভাষার সঙ্গে। ভাষা সাধারণতঃ বীজগণিতের সূত্র হিসেবে গণ্য হয় না ; অবশ্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভাষা এই ধরনের সাঙ্কেতিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ভাষা সুস্পষ্ট অর্থবহ। এমন কথা নেই বললেই চলে যার প্রতি-অর্থ নেই।

'নিজের ঘর' 'মৃত্যু' প্রভৃতি কথার অর্থ হয় আমাদের আকর্ষণ করে আর না হয় বিকর্ষণ করে। যে সব কথার সুস্পষ্ট অর্থ নেই বলে বলা হয় তার সঙ্গে একাধিক আনুষঙ্গিক ব্যাপারের যোগ ঘটে যাওয়ার ফলেই শব্দের নিজস্ব অর্থটুকু হারিয়ে গেছে।

শব্দের এই বিভিন্ন ভূমিকা থাকার ফলে গদ্যসাহিত্যকে 'সঙ্কর শিল্প' বা Hybrid art বলা যেতে পারে। শব্দ কখন কখন তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রতীকরূপে কখন বা গীতময় ধ্বনিরূপে আবার কখন বা আমাদের আবেগের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। শব্দের বিন্যাসগত যে ধ্বনি-সাম্য, তার অন্তরে সঙ্গীতের যে সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, তাকে যথাযথভাবে গদ্য ব্যবহার করে না; কাব্য সেটুকুকে ব্যবহার করে। অবশ্য কখন কখন ছন্দোময় বর্ণবহুল গদ্যের ঢঙে যে প্রবন্ধ লেখা হয় তার মধ্যে শব্দের উপর্যুক্ত প্রসাদগুণ এসে যুক্ত হয়। ক্লাটন ব্রুক বললেন যে গদ্যের বিশেষ গুণ হল সুবিচার, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে তাল রেখে গদ্যের ঢঙটুকু নির্ণীত হয়ে থাকে। গদ্যের বিস্তারটুকু নির্ণীত হয় ভাষার দুটি ক্রিয়ার কথা মনে রেখে; একদিকে ভাষা ভাবের বাহন, অন্যদিকে তা বস্তুর প্রতিচ্ছবি। গদ্য কী না করে? গদ্যে গল্প বলা যায়। দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায়; বিষয়গত জটিলতার সরলীকরণ করে গদ্য, স্থান এবং ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয় গদ্যের মাধ্যমে; আবার কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, কোন ব্যাপারে কাউকে বুঝিয়ে তাকে আপনার মতে নিয়ে আসা, এ সবই হল গদ্যের কাজ। মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে গদ্য ব্যক্ত করে। গদ্য শুধুমাত্র শব্দের অর্থটুকু সম্বল করে কাজ করে না। শব্দের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনাও গদ্যের কাজে লাগে। গদ্য কাব্য থেকে সঙ্গীতের সুরটুকু কর্জ করে। এতো বিভিন্ন ধরনের ভাবের বাহন বলেই গদ্য শুধুমাত্র ভাষার কলাকৌশল মাত্র নয়। কল্পনায় যে সমন্বয় সাধন সম্ভব গদ্য সেই সমন্বয়টুকু সৃষ্টি করে। গদ্য সেই কল্পলোকের উৎস। তাই উপন্যাস গদ্যকে আশ্রয় করে আছে।

কাব্য এমন একটা শিল্প যেখানে ভাবের বাহন ভাষা পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়; কাব্যের ভাষাকে কবি, তাঁর শ্রোতা অথবা পাঠক কেউ-ই ভুলে থাকতে পারেন না। সান্তায়ানা যথার্থই বলেছেন যে কবি হলেন মূলতঃ কথার স্বর্ণকার; কথার সোনা দিয়ে তিনি কাব্যের অলঙ্কার গড়েন। শব্দের যে ইন্দ্রিয়জ আবেদন কবিকে আকর্ষণ করে, কবি তাঁর পাঠককে সেই শব্দের আমন্ত্রণটুকু

পাঠান। অনেকে মনে করেন, যে সব কবির মাতৃভাষা ইতালীয়, তাঁরা সত্যসত্যই ভাগ্যবান। এই ভাষায় স্বরবর্ণের এমন ছড়াছড়ি যে কথা বললেই এক ঝুড়ি স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে হয়; এ ভাষায় কবিতা না লিখে উপায় থাকে না। অবশ্য এটি যদি তার মাতৃভাষা হয়। সুইনবার্ণের মত কবিরা কখন কখন কেবলমাত্র শব্দলালিত্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে এমন সব চরণ লিখেছেন যার বিশেষ কোন অর্থই হয় না। সেই সব চরণে শুধু রয়েছে পদলালিত্য; শুধু রয়েছে ধ্বনি-মাধুর্য।

আমরা এমন একটি কাব্যকলার কল্পনা করতে পারি যে কাব্যকলায় শুধুমাত্র স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর যুক্ত হয়ে অর্থহীন ধ্বনি-সংগতি সৃষ্টি করবে। সে ধ্বনি-সংগতি প্রাচ্যদেশের ঝাড়লণ্ঠনের মত বর্ণবহুল ও ঝলমলে হবে। এমন কবি এবং কাব্যপাঠক রয়েছেন যাঁরা শব্দের বর্ণটুকুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন যেমন করে আমরা জলের বাহার ও পাতার রং প্রত্যক্ষ করি। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী একবার বলেছিলেন যে 'cellor door কথাটি বড়ই মিষ্টি; এমন মিষ্টি কথা আমি জীবনে শুনিনি'; এমন অনেক ইংরেজ কবি আছেন যাঁরা বুঝতে পারবেন যে ঐ বিদেশী ভদ্রলোকটি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন।

শব্দের কারুকার্য সম্পন্ন করাটাই কিন্তু কবির সবটুকু কাজ নয়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির কুশলী সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্যের সবটুকু ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই কুশলী সমন্বয় সাধনকর্মের মাধ্যমে যে আবেদনের সৃষ্টি করা যায় তা কাব্যের ইন্দ্রিয়জ আবেদনেরও সবটুকু নয়। আর এক দিক থেকে ভাষার সঙ্গে সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বরগ্রামের (Tones) মতই ভাষারও বিভিন্ন শব্দাংশ রয়েছে। কিন্তু সেইটুকু সাদৃশ্য ছাড়াও গভীরতর সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। বিভিন্ন স্বরগ্রামের সমন্বয় যেমন সঙ্গীত সৃষ্টি করে না ঠিক তেমনি বিভিন্ন শব্দাংশকে একত্র যোগ করলেই কাব্য জন্ম নেয় না। মানুষের ভাষার মধ্যে যতি আছে, ছন্দ আছে; ভাষার এই ছন্দটুকু এবং শব্দের ছোট ছোট খণ্ডাংশগুলি কবি তাঁর কাব্যসৃষ্টির কাজে লাগান।

কবিতার ছন্দই হল তার বিশেষ সম্মোহনী শক্তি। মানুষের কান এতো সহজে, এমন অনায়াসে কেমন করে ছন্দের আহ্বানে সাড়া দেয় তার রহস্য

বোধ হয় মানুষের জৈব প্রকৃতির অন্তরে লুকিয়ে আছে। ফুসফুসের আকুঞ্চন প্রসারণে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যেও বোধ হয় এই রহস্যের লীলা। সঙ্গীতে ছন্দের লীলা অতিপ্রত্যক্ষ ; কাব্যে ছন্দ এক কল্পনা-রঙীন পরিবেশ সৃষ্টি করে ; এই পরিবেশেই পাঠক কাব্যানন্দের আস্বাদন করে, কবি-কথিত কাব্যলোকে পরস্পরের প্রতিবেশী হয়। কবির বক্তব্য পাঠক শোনেন। কবিতা হল কবির স্বপ্ন, কবি-মানসের অনুভব মাত্র। কবির অভিজ্ঞতার ছোট বড় নানান আকারের ছবি তার কাব্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। কবি তাঁর কাব্যে সঙ্গীতের সুষমাটুকু মিলিয়ে দেন ; হঠাৎ-পাওয়া নানান শব্দালঙ্কার কবি এই কাব্যের মধ্যে আমদানি করেন ; কাব্য আপন স্বরূপে ঝলমল করে ওঠে।

ওয়াল্‌ট হুইটম্যানের কাব্যের দীর্ঘায়িত আলুথালু গতিচ্ছন্দ, পোপের কাব্যের দৃঢ়-পিনদ্ধ চরণ, সুইনবার্ণের কাব্যের দীর্ঘ ছত্র, মহাকবি মিল্টনের অমিত্রচ্ছন্দের সামগ্রিক ছটার গতি তাদের স্ব স্ব কাব্যের আবেদনটুকু নির্ণয় করে। কাব্যের মৌল গতিচ্ছন্দ কবির দেখা স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ চারিত্রটুকু সযত্নে চয়িত শব্দের মাধ্যমে আপনাদের প্রকাশ করে। কিন্তু কবির স্বপ্ন বলতে আমরা কী বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই কবির সৃষ্টি এবং রসিকের রসানুভবের অনেকখানিই নিহিত রয়েছে। কবিতা শুধুমাত্র পদ্যাংশের সমষ্টি-মাত্র নয় ; তার ছন্দ, তার মিল, তার শব্দ, তার অর্থ সবগুলিকে একত্র করলেও কাব্যের স্বরূপটুকু পাওয়া যায় না। কবিতা হল সামগ্রিক সৃষ্টি। একটি সম্পূর্ণ দেহসৌষ্ঠব ; কবিতার জন্ম হয় কবির অবচেতন মনোলোকের গভীরে ; কাব্যের সত্তা হল স্বপ্নের সত্তা যাকে কবি পুঁথির পাতায় অমর করে রেখে যান।

আমরা সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা কিছুই জানি না, যে প্রক্রিয়ায় কবির স্মৃতি থেকে হাজার হাজার ছবি, কবি-মানসের সীমাহীন উদ্বেগ, তাঁর আনন্দ-উদ্বেলতা এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির কাব্যরূপটুকুর সৃষ্টি করে। আমরা যদি সেটুকু জানতে পারতাম তা হলে কবি-প্রতিভা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মানুষেরা কাজ করছেন তাঁদের কৃতি-রহস্যেরও অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হতো। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ বললেন যে কাব্য হল শান্ত মনে জীবনের অতীত আবেগময় মুহূর্তগুলিকে স্মরণপথে আনয়ন করা। তাঁর উক্তিতে কাব্যের ছন্দ-মিলের অতিরিক্ত যে সামগ্রিক

আবেদন রয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে। কবি-মনের কোন একটি বিশেষ অবস্থায় কবি আপনার মনের গহনে লুকিয়ে রাখা ছবির সঙ্গে আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবভাবনাকে সমন্বিত করে যে দিবাস্বপ্ন দেখেন তার নামই কবিতা। একটি চতুর্দশপদী কবিতাকে সাধারণভাবে গদ্যে হয়ত অনুবাদ করা যায়, তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকেও না হয় ব্যক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে পারিপার্শ্বিকের চাপে আমাদের আনন্দের ভোজে পংক্তিভোজন করার প্রবৃত্তিতে ভাঁটা পড়ে। যদিও এই আনন্দের আস্বাদনে আমাদের জন্মগত অধিকার। কাব্যে যে অনুভূতির কথা বলা হয়, তার যে অনুরণন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় কাব্যের সবটুকু বিস্তার জুড়ে, তা কিন্তু কাব্যের জীবন নয়। তাই কবিতার ভাব তদ্‌বর্ণিত অনুভূতির কথা ভাষান্তরে বললেও তার মধ্যে মূল কবিতার রসটুকু মেলে না। পাঠকের চেতনায় যখন কবির স্বপ্নের প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে, যখন কবির সামগ্রিক দৃষ্টিটুকু পাঠক আপন অন্তর্দৃষ্টির বলে আপনার করে নেয়, তখন কবিতার আবেদনটুকু অব্যাহত থাকে, অনন্তের মন্দিরে কাব্যের জীবন্ত বিগ্রহের প্রচেষ্টা তখনই সম্ভব হয় যখন কবির দেখা জগতের টুকরো ছবি, তার অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ, তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, তার আনন্দানুভূতির ভূমা-রূপ আপনার সত্তায় সমন্বিত হয়ে যায়।

কবির কাব্যে যে অনাদ্যন্ত প্লেতোনিক সমগ্রতাটুকু পাই তাকেই আমরা 'কবির স্বপ্ন' আখ্যা দিয়েছি। কবি এই স্বপ্নটুকুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেন। কাব্যের ছন্দ এই স্বপ্ন-সঞ্চারে সহায়তা করে; কবিতার জাদু আছে কবিতা পাঠককে সম্মোহিত করে।

কবিতার জাদু হল কবির ভাষার মনোহারিত্ব। তার সম্মোহনশক্তি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে দুর্বারভাবে। আমরা কোন কবিকথিত মানসিক পরিবেশটুকুতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের জীবনের গতিচ্ছন্দে কবিচিত্তের বহমানতা এসে ঢেউ তোলে। আমরা কবির সঙ্গীতে মুগ্ধ হই। তাই কাব্যের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন উপাদানে কাব্যকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা কবিতার স্বরূপটুকুকে কিছুতেই ধরতে পারি না। কবির জৈবিক স্বপ্নে আমরা মুহূর্তের জন্য অংশভাগী হয়ে পড়ি; এই স্বপ্নই ত কাব্য। কাব্যের হৃৎস্পন্দন আমাদের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিশে যায়। যাঁরা কবি তাঁরা জানেন যে মনের

গহনে কাব্যের সূত্রপাত হয় অর্থহীন সুরের ঝংকারের মত। ইংরেজী সাহিত্যে এমন অনেক কবিতার কথা আমরা জানি যার সূত্রপাত কবি-মনে হয়েছিল এক অস্পষ্ট সুরের ইঙ্গিত থেকে; সে সুরে কথা তখনো সংযোজিত হয়নি; কবি-কল্পনার অস্পষ্টতা ক্রমে কেটে গিয়ে সে সুর আকার পেলো, কথা পেলো, অর্থ পেলো। কাব্যরসিক জানেন যে শব্দের অন্তরালে, অর্থের পশ্চাতে যে সঙ্গীতের ধারা, যে ছন্দের প্রবাহ নিত্যবহমান তার জন্যই তিনি কাব্য ভালবাসেন। মার্ক টোয়েনের কাব্যে পাওয়া অতি নিকৃষ্ট ছন্দই হোক অথবা মিল্টনের কাব্যে পাওয়া সূক্ষ্ম উচ্চাবচতা-সমাকীর্ণ অমিত্রচ্ছন্দই হোক, যে কোন ধরনের ছন্দকে আশ্রয় করে কাব্যকে থাকতে হবেই। ছন্দই হল সুরের প্রাণ। সুর নইলে কবিতার হৃৎস্পন্দন থেমে যায়। কবিতার ভাষায় যতই চাতুর্য থাক, ছন্দের সম্মোহনটুকু না থাকলে কবিতা পাঠকের হৃদয়ে সুরের অনুরণনটুকু জাগায় না; সেই মুহূর্তের জন্য কবির স্বপ্ন পাঠকের প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠে না।

ছন্দের গতি এবং যতি, এরাও কাব্যের আবেদনটুকুকে পুরোপুরি ব্যাপ্ত করতে পারে না। কথা যদি শুধু পদের, পদাংশের যোজনায় ছন্দ-সুরটুকু মাত্র হতো তা হলে তা পুরোপুরি শব্দ ও শব্দ-সমন্বয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। কোন একটি বিশেষ শব্দকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, যে ভিন্নধর্মী বিচিত্রতর জটিল হার্মনির সৃষ্টি সম্ভব, তাদের কোনটিকেই আমরা কাব্যে খুঁজে পেতাম না। কেউ কেউ কাব্যকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কাব্য-সঙ্গীত সঙ্গীতের চেয়ে খাঁটি হলেও, তা সূক্ষ্ম হবে। কাব্যে আমরা কথার ব্যবহার করি এবং এই কথা শুধু শব্দ নয়, আমরা তা বলি মনের ভাব প্রকাশের জন্য। কথার গুরুত্ব কখনই উপেক্ষা করা যাবে না। যদি কবি কথার এই প্রকাশ-ক্ষমতাটুকুকে পুরোপুরি কাজে না লাগান তা হলে তিনি তাঁর কাব্যকণার অন্যতম মুখ্য উৎসের অপচয় করবেন বলেই আমাদের ধারণা।

কথার একটি তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত উৎস থাকে আর থাকে মনস্তত্ত্ব-সম্মত মৌল উপাদান। এই দ্বিবিধ বিষয়ের উপরে কবির শিল্পকলা অংশতঃ নির্ভরশীল। কবি-কথার রসাশ্রয়তে বেশি মাত্রায় আগ্রহী। বৈজ্ঞানিক অবশ্য একে আমল দেন না। কবির কাজ হল সর্বোপরি কথার শক্তিটুকুকে নিয়ে; কথার সত্যাসত্য

নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। কবি অভিজ্ঞতাকে প্রাণনোজ্জ্বল করে পরিবেশন করেন; তা সে সংবেদনই হোক, তার নিজের দলের বিশেষ ভাব-ভাবনাই হোক, তাকে প্রাণবান করে, উজ্জ্বল করে কবি আপন কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তেমনি ধারা অপরের ভাব-ভাবনা, অপরের সংবেদনকেও কবি আপনার কল্পনার রঙে ঐশ্বর্যবান করে কাব্যে পরিবেশন করেন কখন কখন। বাইরের যে অতিপ্রত্যক্ষ জগৎ কবিচিত্তের দ্বারে বার বার আঘাত হেনে কবির ইন্দ্রিয়-চেতনাকে জাগ্রত করে, তাঁর আবেগকে উদ্দাম করে দেয়, তাঁর মনের ভাব-সমুদ্রে তুফান তোলে, সেই প্রাকৃত জগৎকে কবি আপন কাব্যে রমণীয় মর্যাদা দেন। কাব্য-পাঠকের মনে কবি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে চান। কাব্যে কথিত রূপকল্প, কবির আবেগ ও চিন্তা প্রভৃতিকে কাব্য-পাঠকের চিত্তে সঞ্চার করে দেওয়া কবির উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রের বহির্বিষয়ক সাঙ্কেতিক বার্তা বিনিময়ে ইংলণ্ডের পরিবর্তে × চিহ্ন ব্যবহার করা চলে। কিন্তু সেক্সপীয়র ইংলণ্ডের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র তর্কশাস্ত্রবিদের সংজ্ঞা নয়। সেক্সপীয়র বললেন: 'এ দেশ শক্তি-ঐশ্বর্যে পরম গম্ভীর। মঙ্গলের পীঠস্থান, স্বর্গীয় উদ্যান ইডেনের অন্যতম রূপ একে দ্বিতীয় স্বর্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'ইংলণ্ড' এই শব্দটি নানান ভাব, স্মৃতি ও কল্পনার উদ্দীপক; শৈশবের কত স্মৃতি, ইংরাজ জাতির ইতিহাসের কত অতীত ঘটনা, কত না রাজনীতি পাঠকের কল্পনায় ভীড় করে আসে। কবিতার কথাগুলি অঙ্কশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র নয়; তা হল আবেগের উদ্দীপক। তারা শুধু বস্তু বা বিষয়ের কথা বলে না; তারা বলে জাগ্রত মানবাত্মার কথা। কবি তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষায়, তাঁর ছন্দের গতিতে, তাঁর কাব্যের অনবদ্য শব্দসুষমায় পাঠকের স্তিমিত কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করে তোলেন।

কবি এই যে পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেন তাঁর বিশিষ্ট শৈলীতে কাব্যের কথাগুলিকে সাজিয়ে, তার ফলে পাঠক শিশুসুলভ কল্পনার আশ্রয়ে নতুন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেই অভিজ্ঞতা পুরানো গতানুগতিকতাকে অস্বীকার করে বিচিত্রতর ইন্দ্রিয়জ সংবেদনকে আশ্রয় করে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি তাঁর কাব্যে অভিজ্ঞতায় পাওয়া সমস্ত খুঁটিনাটি শুদ্ধ এক একটা আস্ত সংবেদনকে চিত্রিত করেন। ব্যস্তবাগীশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চোখে যে রং, যে গন্ধ, যে স্বাদ, যে স্পর্শ একেবারে রোজনামচার

ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকেই কবি এক এক করে বর্ণনা করেন। এই ধরনের কাব্য-কলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই রুপার্ট ব্রুকের 'Great Love' কবিতায়। আমরা যৌবনে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য থাকার সময়ে যে সব উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতময় মুহূর্তগুলো কাটাই, কবি তারই স্মারকবাণী আমাদের শুনিয়েছেন :

'These I have loved :
White plates and cups, clean-gleaming.
Ringed with blue lines ; and feathery, fairy dust ;
West roofs, beneath the lamp light ; the strong crust
Of friendly bread ; and many-tasting food ;
Rainbows ; and the blue bitter smoke of wood ;
And radiant raindrops crouching in cool flowers ;
And flowers themselves, that sway through sunny hours,
Dreaming of moths that drink them under the moon ;
Then, the cool kindness of sheets, that soon
Smooth away trouble ; and the rough male kiss
Of blankets ; grainy wood ; live hair that is
Shining and free ; blue-massing clouds ; the keen
Unpassioned beauty of a great machine ;
The benison of hot water ; furs to touch ;
The good smell of old clothes ; and other such—
The comfortable smell of friendly fingers,
Hair's fragrance, and the musty reek that lingers
About dead leaves and last years ferns……
Dear names
And thousand other throng to me ! Royal flames ;
Sweet water's dimpling laugh from tap or spring ;
Holes in the ground ; and voices that do sing ;

Voices in laughter, too, and body's pain
Soon turned to peace ; and the deep-panting train ;
Firm sands ; the little dulling edge of foam
That browns and dwindles as the wave goes home ;
And washen stones, gay for an hour, the cold
Graveness of iron ; moist black earthen mould ;
Sleep ; and high places ; foot-prints in the dew,
And oaks ; and brown horse-chestnuts, glossy-new ;
And new-peeled sticks , and shining pools on grass ;
All these have been my loves.'

কবি তাঁর কবিতায় যে অভিজ্ঞতার কথা বলেন সে অভিজ্ঞতায় শিশুর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সজীবতা। কাব্যের এই গুণটি সকল কাব্যেই বিশেষ করে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে অতি প্রত্যক্ষ। হোমারের কাব্যে এই ধরনের অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় ; কীটস এবং মিল্টনের কাব্যেও এই গুণের অসদ্ভাব নেই। মিল্টনের কাব্যে মহত্তর মহিমার জটিলতা এই গুণটিকে ক্ষুণ্ণ করে নি। বস্তুর বর্ণোজ্জ্বল রূপটিকে কবি তাঁর সুষ্ঠু শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োজনের মাধ্যমে আমাদের দেখান। কবি বস্তুটিকে বর্ণনা করেন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাটুকুর নির্দেশ দিয়ে ; সমুদ্রকে তিনি মদের মত অন্ধকার বলেন, এথেনের চোখকে কটা বলেন, প্রত্যুষকে বলেন যে তার না কী গোলাপের মত আঙুল। পশমের স্পর্শ, পুরোনো কাপড়ের গন্ধ, বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন আঙ্গুলের ছোঁয়া, গোলাপের ঘ্রাণ, কাঁটার হুল ফুটিয়ে দেওয়া—এই সব ভাষা ব্যবহার করে আপনার ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার কথা পাঠককে মনে পড়িয়ে দেন।

আমাদের জগতের প্রতি যে প্রতিক্রিয়াটকু সাধারণতঃ হয়ে থাকে তা কবি আমাদের ভুলিয়ে দেন, অনেকের মতে এইটুকুই হল কবির কাজ। আমাদের আদিম সংবেদনের রূপটিকে পুনরুদ্ধার করাই হল কবিকৃতি। শিশু বাঁধাধরা ছকে চলতে এবং বলতে শেখার আগে তার চোখ বা কান যে বিশুদ্ধ রূপ দেখে ও শব্দ শোনে, সেইটুকু রসিকজনকে দেখানো এবং শোনানই হল কবিকুলের মুখ্য কর্তব্য। শিশু যখন ট্রেনগাড়ী দেখে তখন তার কানে কানে ইঞ্জিনের

অদ্ভুত শব্দটাই বড় করে বাজে। তাই শিশু ট্রেনকে 'ছু ছু' নাম দিয়েছে। তেমনিধারা কবিও এই পরিচিত পারিপার্শ্বিককে অনেক নতুন নতুন অভিধায় অভিহিত করেন কারণ কবির জটিলতাবর্জিত ইন্দ্রিয়-সংবেদনে পৃথিবীটা অন্যভাবে ধরা দেয়।

এই ইন্দ্রিয়জ ছবিকে, সংবেদনকে মুখ্য বলে কবি বিশেষ গৌরব দেন, তাই কবি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা একাধারে সরল ও আবেগ-সমৃদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের কাছে তার আবেদন সর্বাগ্রগণ্য। যে কাব্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সাড়া জাগায় না তা আমাদের আবেগকেও উদ্বেল করে তুলতে পারে না। যে সব কথায় সহজেই ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় তাদের এমন অসংযত এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিত্যদিন ধরে হয়েছে যে কবি আর সহজে তাদের দিযে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারবেন না, তাই কবিকে নতুন বিষয়ের কথা, নতুন অনুষঙ্গের কথা চিন্তা করতে হয়। ঝলমলে কোন অনুষঙ্গের কথা কবি হয়ত অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন। চমক ভাঙ্গে আমাদের, আমরা মনোযোগ দিই ; ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবি পাদ্রীকে বলছেন ঃ

'The modest water saw its God and blushed.'

এই বিস্ময়কর অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক বেশি সজাগ হয়ে দেখি কেমন করে জল মদে পরিণত হল।

উপমা এবং রূপকের ওপরে অনেক বই লেখা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হয়ত অনেক সহজ করে সরল করে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কবির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যেসব বস্তুর নিত্য যোগ তা থেকে বক্তব্য বিষয়টিকে মুক্ত করে নিয়ে উপমা এবং রূপকের সাহায্যে নতুন নতুন অনুষঙ্গের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দিলে আমাদের পক্ষে যে কাব্য থেকে যে তথ্যটুকু লাভ করা সহজ হয়, তা সজীব হয়ে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। রূপকের সাহায্যে শুধুমাত্র কাব্যের বিষয়বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের মর্যাদাটুকু আনে না ; কাব্যের বিষয়বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার করা হয় তাকে আমাদের আবেগ, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করে। অন্যভাবেও বলা যায় যে আমাদের কোন কোন আবেগানুভূতিকে ইন্দ্রিয়জ অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে হঠাৎ অতি-মাত্রায় প্রাণবন্ত করে তোলা হয়।

'My love is like a red, red rose.'

অথবা 'Du bist wie eine Blume.'

অথবা আবার বলি রুপার্ট ব্রুকের একটি আশ্চর্য সুন্দর কবিতার কথা। 'The Dead' কবিতায় কবি বলেছিলেন সেই সব মৃত মানুষদের কথা যাঁরা জীবনকে ভালবেসেছিলেন, যাঁরা সুন্দরকে ভালবেসেছিলেন। কবি বলছেন নিত্য-সুন্দর ফুলের কথা, বহুমূল্য পোশাক পরিচ্ছদের এবং দয়িতের গণ্ডদেশের কথা যা একদিন অধুনা-মৃতদের পরম প্রিয় ছিল। তারপরে কবি কোন মন্তব্য না করেই বলছেন :

'There are waters blown by changing winds to laughter,
And lit by the rich skies all day and after.
Frost with a gesture stays the waves that dance.
And wandering loveliness ; he leaves a white
Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining peace under the night.'

দিনের বেলা আমরা যেসব নৃত্যচপল ঊর্মিমালা প্রত্যক্ষ করেছি তারা হঠাৎ এসে প্রাণের জগৎটার প্রতিনিধিত্ব করে এবং মৃত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে রাত্তিরের শান্ত পরিবেশে দেখা স্তব্ধগতি জলরাশি।

এই উপমা এবং রূপকের ব্যবহার করেন কবি গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতার প্রতিবাদ হিসেবে। আকাশের চাঁদ আর অর্থহীন শুভ্র চক্রাকার বস্তুমাত্র নয়; চাঁদ হল রাত্রির রাণী। সূর্য হল আপনার রথে সংক্রমণশীল যৌবন-লাঞ্ছিত দেবতা। সুন্দরকে বলা হয়েছে যে সে হল পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই অন্ধকার দেশের প্রোজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা।

'The soul of Adonais like a star
Beacons from the abode where the eternal are.'

এ সত্য অনস্বীকার্য যে সকল ভাষাই রূপকাশ্রয়ী। অভিজ্ঞতায় যেটুকু পাওয়া যায়, নানানভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে ব্যঞ্জনাময় করাই হল আলোচনার উদ্দেশ্য। যে সব কথা শোনামাত্র ইন্দ্রিয় তার অর্থ গ্রহণ করে সেই ধরনের কথা ব্যবহারের ফলে, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আবেগের

নিগূঢ় যোগসাধনের ফলে অথবা আমাদের আবেগজীবনের সঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গূঢ় সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা ঘটলে আমরা কবির কাব্যকে অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি, অর্থের উপলব্ধি সহজ হয়। এই কারণেই জোর করে বলা যায় না—কোন একটি কবিতার সঠিক অর্থ কী। তার অনুবাদও সম্ভব নয়। পেয়ারা আস্বাদন করে তার স্বাদটুকুর যথাযথ বর্ণনা দেওয়া বা পিচ ফলের স্পর্শটুকু সঠিক নির্ণয় করা কবিতার অনুবাদ করার মতই দুরূহ কর্ম। যে সঙ্গীতের পরিবেশে কবি একটি বিশেষ বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে শব্দায়ন করেছেন কাব্যের ভাবটুকুকে প্রকাশের জন্য, যে সব রূপকের ব্যবহার করেছেন ভাবকে তীব্র করার জন্য, সে সবই অনুবাদকর্মে হারিয়ে যায়। কাব্য হল শব্দে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা অথবা বলতে পারি প্রাণই শব্দের রূপে কাব্যে আবির্ভূত হয়। পার্থিব জগতটা কবির ভুবনে পরিণত হয়; সেই ভুবনটিই তাঁর কাব্যের উপজীব্য। বোদ্ধা পাঠক যখন কাব্য পাঠ করেন তখন কবির চারপাশের পার্থিব জগতটাকে দেখতে পান। কবি এইটুকু অনায়াসে সম্পন্ন করেন তাঁর সঙ্গীতময় এবং চিত্রময় ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে।

শিল্পীর মতই কবি রঙ ও রূপের পূজারী। আমরা একটি কবিতা সংগ্রহ বা চয়ন করতে পারি যার বিষয়বস্তু গোলাপফুল। কিন্তু কবির মানসিকতায় শিশুসুলভ সতেজ ভাবটুকু থাকলেও কবি ত আর শিশু নন। তাঁর অনুভূতির শূন্যতা অনিশ্চিত, মেজাজের জটিলতা শিশুর অভিজ্ঞতায় একেবারেই অলভ্য। তাঁর কবি-কৃতির কৌশলই হল তার খেয়ালখুশি, তার আবেগকে প্রাণবন্ত করা, তাদের সত্য করে তোলা; এইটুকু না হলে কবি-পাঠকের কাছে তাদের যথাযথরূপে হাজির করতে পারেন না। কবি যে-পন্থায় তাঁর সংবেদনকে উজ্জ্বলতর করে তোলেন, সেই একই কৌশলে এই কাজটুকুও তিনি সমাধা করেন। কবিতাকে অনেকসময় অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ গীতিকবিতারই বিষয়বস্তু হল কবির একান্ত ব্যক্তিগত আবেগময় জীবন। কবিরা বারবার মানুষের জন্ম এবং যৌবনকে ঘিরে কাব্য রচনা করেছেন। কারণ কবিরাও মানুষ এবং মানুষের আবেগের প্রতি তাঁদের অভ্রান্ত আকর্ষণ। কবিরা যখন এই সব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাঁদের সৃষ্টিতে

প্রাণস্পন্দনটুকু প্রত্যক্ষ হয়, তাঁদের কাব্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। এর কারণ তাঁদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু সাধারণ-বোধ্য ও সর্বজনীন বলে নয়, তাঁদের প্রকাশটুকু অনন্যসাধারণ বলে। কাব্যে কবি মানুষের কোন একটি অবিসংবাদিত রূপে গ্রাহ্য মানস অবস্থার কথা বলেন মৃত্যুহীন ভাষায় :

Oh, never say that I was false of heart.
When absence seemed my flame to qualify.
As easy might I from myself depart
As from my soul which in thy breast doth lie.

হাজার হাজার নরনারী তাঁদের প্রেমাস্পদের জন্য অস্পষ্টভাবে এক ধরনের সুতীব্র আবেগ অনুভব করেন বটে কিন্তু তাঁরা সকলেই সেক্সপীয়রের সেই সনেটটিতে নিজেদের অনুভূতিকে খুঁজে পান; কবি সকলেরই আবেগের কথাটুকু অনন্যসাধারণ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। কবি-কথিত প্রেমের সজীবতা এবং প্রোচ্ছন্ন ব্যস্তবতা তাঁদের আপন আপন অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়।

আবেগের ভুবনে কাব্য হল সর্বোত্তম প্রবক্তা; অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে আবেগকে এমন সুন্দর করে প্রকাশ করা যায় না! সাধারণ:মানুষের চোখে বা তর্কশাস্ত্রবিদের কাছে যা একান্তই উপেক্ষনীয় তা-ই কবির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। জলের রাসায়নিক তত্ত্বে কবির কোন আকর্ষণ নেই; তিনি দেখেন জলের ওপরে রোদের ঝিকিমিকি; আলোর শুভ্র আভা। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নিয়ে কবি মাথা ঘামান না। তিনি আলোর আশীর্বাদটুকু অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। মানুষের সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে কবির যে নিত্যযোগ এবং তদ্‌জাত যে আবেগ কবির মনে সঞ্চারিত হয় তা একমাত্র কবিরই অনুশীলনের বস্তু। বৈজ্ঞানিক অথবা সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যে কাব্যের কোন আবেদন নেই তা যেমন মৃত ঠিক তেমনি যে কবিতা আবেগের উদ্রেক ঘটায় না তাও তেমনি মৃত। আবেগের উদ্রেক নানান ভাবে ঘটতে পারে। ব্লেক্ তাঁর দুজ্ঞের্য়বাদের দ্বারা, ডোন তাঁর যৌন আবেদনের দ্বারা, দান্তে তাঁর ভগবদ্ প্রীতির সাহায্যে এবং শেলী তাঁর প্লেতোনিক ভাববাদের সহায়তায় আমাদের আবেগের প্রস্রবনকে বারবার মুক্ত করে দিয়েছেন। কবির মনে যে চিত্রকল্প

এবং সঙ্গীতের সমারোহ শুরু হয় তা হল কাব্য-সৃষ্টির প্রাথমিক: অবস্থা ; প্রবল ভাবে বাঁচার জন্যই এই চিত্রকল্প ও সঙ্গীতের সমারোহটুকু সম্ভব হয়; কবি এই প্রাচুর্যটুকু মনে মনে উপলব্ধি করেন, তাঁর আবেগ-অনুভূতির অতলতা-টুকু তিনি প্রকাশ করতে চান এবং অনেক সময়ে আপনার অজান্তে তিনি অপরের সঙ্গে এটুকু একত্রে উপভোগ করতে চান। What is Art গ্রন্থে ঋষি টলস্টয় নিষ্ঠাকে নন্দনতত্ত্বের গুণ হিসেবে খুব উচ্চে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে টলস্টয় নৈতিক নিষ্ঠাকে বুঝেছিলেন। নন্দনতত্ত্বের ভাষায়ও নিষ্ঠাকে গুণ বলে গণ্য করা যায়। কবিতার মধ্যে কবি আপনার উৎসাহ-আবেগ বহুলপরিমাণ অনুস্যূত করে দেন এবং কাব্যের আঙ্গিকের মধ্যে এমন কৌশল থাকে যা পাঠকের মনে কবির উৎসাহ আবেগকে সঞ্চার করে দিতে পারে। বস্তু, ব্যক্তি অথবা ভাব কবির অনুভূতির উদ্রেক ঘটাতে পারে ; কবি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়তে পারেন যে কোন একটি উদ্দীপকের প্রতি-ক্রিয়ার ফলে। মানুষের মনে ভাবের অস্তিত্বও তার পক্ষে মূল্যবান অভিজ্ঞতা। কবির আঙ্গিকের প্রসাদগুণে এই ভাবেরও হাত গজাতে পারে ; একথা বললেন মহাদার্শনিক হেগেল। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের হৃদয় ডাফোডিলদের আনন্দে নৃত্য করে। কিন্তু ভাবও হৃদয়কে নৃত্যছন্দে স্পন্দমান করে তুলতে পারে। কবি ভগ্‌হান লিখেছেন :

"I saw Eternity the other night
Like a great ring of pure and endless light."

ইংলণ্ডে একশ্রেণীর কবি রয়েছেন যাঁদের কাব্যে ভাব ফুলের মত, সুন্দর তরুণীর মত মনোরম মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। লুক্রেটিয়স থেকে আর্লিংটন রবিন্সন পর্যন্ত কবিকুল এই শ্রেণীভুক্ত।

এমন ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে যে দর্শন ও কাব্যের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। চিন্তাবিদের বিশ্লেষণ-মুখীনতা ও কবির ইন্দ্রিয়জ আবেগ-প্রবণতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে।

আমরা প্লেতোর লেখার মধ্যে দেখেছি কী ভাবে ভাব আবেগতপ্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে পারে। যে কোন ভাবকে কোন রূপক অথবা রূপকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় ; কেবলমাত্র সূত্রাকারেই তা প্রকাশ-যোগ্য নয়। ফ্রিডাম গ্রন্থে প্লেতো অমরতাকে নিয়ে যে রূপকথার সৃষ্টি করেছেন, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

প্রতিমার মাধ্যমে তাকে রূপ দিয়েছেন, বলেছেন যে আত্মার রথ ছুটে চলেছে স্বর্গকে বারবার প্রদক্ষিণ করে, তা প্রণিধানযোগ্য। লুক্রেটিয়াসের মতে জীবনের আবেগময় পরিণতি দেখিয়েও দেখানো যায় যে ধর্মকে ঘৃণা করেও স্বর্ণবর্ণোজ্জ্বল স্বাধীনতা এবং জীবন সম্বন্ধে বস্তুকেন্দ্রিক ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কবি-কল্পনা নানা ভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারে—ছোট বড়, মহৎ অথবা ক্ষুদ্র যে কোন উদ্দীপকই এই কাজের জন্য যথেষ্ট। যদি কবির কল্পনার বিস্তার এবং গভীরতা থেকে থাকে তা হলে তিনি লুক্রেটিয়াসের মত সহজেই প্রকৃতির প্রাকৃত সৌন্দর্যকে মহাকাব্যের উপজীব্য করে তুলতে পারবেন; সেই কাব্যে একদিকে যেমন বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং মহিমা থাকবে অন্যদিকে তেমনি সেই কাব্যে সঙ্গীত এবং আবেগময় রূপকল্পেরও অসদ্ভাব হবে না। কবির স্বভাবজ কাব্য-শক্তির ধর্ম হল ছন্দোময় চিত্রধর্মী, উদ্ভাবনী ক্রিয়া এবং এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিমুক্ত অনুসন্ধানী মনের সন্ধান সচরাচর প্রযুক্ত হয় না। যখন এই দুটো ভিন্নধর্মী ক্রিয়া যুক্ত হয় তখন আমরা প্রবল আবেগমুখর The Divine Comedy অথবা On the nature of things অথবা Paradise Lost-এর মত মহাকাব্যের সন্ধান পাই। আমাদের যুগেও হয়তো এমন কাব্য রচিত হবে। এমন কবি হয়তো আবির্ভূত হবেন যাঁর লেখায়, বস্তু-জগতের সবটুকু জটিলতা এবং অদৃষ্টের লীলা কল্পনা-মুখর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করবে, এবং পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনাকে একই সঙ্গে উদ্দীপ্ত করে তুলবে। স্বধর্মে কোন বিষয়েই ও আপনাকে একান্তভাবে কাব্যের উপজীব্য বলে দাবী করতে পারে না। যা আছে তা হল কবি-প্রতিভা। এই প্রতিভা কখন একটি গোলাপ-কোরককে নিয়ে কাব্য রচনা করে আবার কখন তা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন কাব্যের উপজীব্য মনে করে। কবির কল্পনাগত অভিজ্ঞতার উপর এটা একান্তভাবে নির্ভরশীল।

গদ্যের শিল্পরীতি আমাদের অন্য আর এক জগতে নিয়ে যায়। অবশ্য গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে এমন একটা ভূখণ্ড রয়েছে যেটা উভয়েরই এলাকা বলে বিবেচিত হতে পারে। গদ্যের যে প্রান্তিক রূপ, সেইরূপে আমরা দেখি ভাব ভাষাকে আশ্রয় করে আপনাকে প্রকাশ করছে এবং কী প্রকাশ করছে গদ্যে সেটাই বড় কথা; কীভাবে প্রকাশ করছে সেটা বড় কথা নয়। গদ্য তার এই প্রান্তিকরূপে আপনার শিল্প-প্রকৃতিটুকু হারিয়ে ফেলে; সে শুধুমাত্র প্রকাশের

বাহন হিসাবে পরিগণিত হয়। গদ্যকে এইরূপে আমরা সঙ্কেত চিহ্নের, সাঙ্কেতিক বার্তার অথবা কথার ব্যবহার কম করার সূত্র হিসাবে, তাদের বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করতে পারি।

গদ্যের যে সীমান্ত এসে কাব্যের সীমান্তের সঙ্গে মিলে গেছে ঠিক সেইখানে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে তফাৎ করা দুষ্কর। গদ্যের মধ্যেও বিশুদ্ধ ভাষাগত উপাদান ও বিশুদ্ধ সংগীত উপাদানের আবিষ্কার করা যে কোন লেখক অথবা পাঠকের পক্ষে সহজসাধ্য। সংবেদনগত রীতিনৈপুণ্যে গদ্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন সমন্বয় ঘটিয়ে যে ধরনের সৌন্দর্যসৃষ্টি করে তা কাব্যের মত মনোহারী না হলেও, তা যে রমণীয়, একথা অনস্বীকার্য। গদ্যের ছন্দ হল বিমুক্ত ছন্দ, কাব্যের মিলের থেকে এর প্রকৃতি সূক্ষ্মতর। আপন স্বরূপে গদ্যকে শিথিল কাব্যরূপ বলা যেতে পারে। প্যাটারের মত লেখকের লেখা আমরা পড়ি তার সুন্দর শব্দবিন্যাসের জন্য ; ডি. কুইন্সের রচনা পড়ি তাঁর চিত্রকল্প এবং গদ্যছন্দের উৎকর্ষের জন্য ; রাস্কিন পড়ি তাঁর স্থানে স্থানে বর্ণোজ্জ্বল বর্ণনার জন্য। অনেকের মতে এই সব লেখা গদ্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়, কেন না এদের মধ্যে অর্থের প্রাঞ্জলতা নেই।

গদ্য বহুবিধ এবং এর অত্যদ্ভুত নমনীয়তা নানাবিধ কার্য-সম্পাদনে সহায়তা করে। গদ্য এমন এক শিল্পের বাহন যে শিল্পে রীতিটুকু মুখ্য নয়। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা লেখকের ভাব অথবা মানসিক অবস্থার রূপটুকু খুঁজি, সেই রূপে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাব্যিক প্রকাশটুকু দেখতে চাই। কবিতার মত অতোখানি সংবেদনশীল প্রকাশ না চাইলেও আমরা গদ্যসাহিত্যে লেখকের প্রজ্ঞার অনন্যসাধারণ প্রকাশটুকু দেখতে পাই। সেই অপরূপ প্রকাশভঙ্গী বক্তব্যের অধিক অর্থ বহন করে।

নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শের নিদর্শন হিসাবে উপন্যাস বিশেষ আগ্রহান্বিত মনোযোগের দাবী রাখে। কিন্তু সৃষ্টি-কর্মের নিদর্শন হিসাবে সমগ্র কল্পনা প্রক্রিয়ার প্রকৃতির উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। প্রাথমিক বিস্ময়-জ্ঞান থেকে আরম্ভ করে করে সকল অভিজ্ঞতাই হল কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাসমাত্র। আমরা বস্তুকে দেখি না, আপনার প্রকৃতি এবং স্বভাবের নিরন্তর উদ্দীপন থেকে আমরা বস্তুর রূপটুকুকে গড়ে নিই। রূপকার্থে বলছি না, যথার্থই টেবিল, চেয়ার, গাছপালা, বাড়িঘর, শাকসবজি, রাজরাজড়া, এরা সবাই

আমাদের কল্পনাজাত। সংবেদন প্রবাহ থেকে আমরা যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই তা দিয়ে আমাদের চারপাশের স্থায়ী বস্তুজগৎটার নির্মাণ সম্ভব হয়। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা বিদ্যমান তা স্থপতির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। অন্যলোক সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি, আমাদের নিকটতম বান্ধব অথবা পরিচিত ব্যক্তিরও আমরা যে রূপ কল্পনা করি, তাদের সঙ্গে নিত্য আলাপ-আলোচনা, ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তকে সমন্বিত করে যে কল্পিত জগৎটুকু সৃষ্টি করি তা হল আমাদের কল্পনার স্থাপত্য-শক্তির নিদর্শন।

আমাদের সমস্ত জ্ঞানই হল কল্পিত ছবি, একে অলিখিত কল্পনাও বলা চলে। ঔপন্যাসিক ইচ্ছা করেই খুঁটিনাটি তথ্যাবলীকে পশ্চাদপটে স্থান দেন, ঘটনাবলীর মধ্যে পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্মপ্রেরণা, আবেগ ও অভিমতকে চারিত্রসত্তা দান করেন। ভগবানের চেয়েও অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত ভিত্তির উপর উপন্যাসকার আপন উপন্যাসের জগতটুকু সৃষ্টি করেন। আমাদের অর্ধপরিচিত প্রতিবেশীর চেয়েও স্পষ্টতর ও অবিসংবাদিত সত্তা নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন টম জোনস্, ডেভিড কপারফিল্ড অথবা আনা কারেনিনা। এই সব চরিত্র শুধু যে বেঁচে আছে তাই নয়, এরা এদের নিজের জগতে বেঁচে আছে। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের পরিবর্তন সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আনা কারেনিনা যে সমাজে তাঁর অপরূপ ঐশ্বর্যবান অথচ তাৎপর্যহীন জীবন যাপন করেছিলেন তা অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু এই জীবনের পদ্ধতি, আনুষঙ্গিক গ্রাম্য জীবনযাত্রা, এর শুভাশুভের ধারণা চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছে। টলস্টয় একটি নতুন সভ্যসমাজের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি কোন সমাজব্যবস্থার কথাচিত্র অঙ্কন করেন নি। কাল্পনিক উপন্যাসের মহত্তম আবেদন হল এই যে আমরা উপন্যাসবর্ণিত পাত্রপাত্রীর ঐশ্বর্যের অংশভাগী হতে পারি অনায়াসে শুধুমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করে। আমরা তাদের জয়লাভে বা বিপর্যয়ে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করি একেবারেই সত্যিকারের কোন মূল্য না দিয়ে। আমরা যে দেশে কোনদিনও যাইনি সেই দেশে এদের সঙ্গে বিচরণ করি; এঁদের সঙ্গে যে ভালবাসার আস্বাদন করি তা পূর্বে কোনদিনও আস্বাদন করার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের পরিচিত জীবনাপেক্ষা বিস্তৃততর,

বিচিত্রতর এই জীবনে অনুপ্রবেশ লাভ করে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের জীবনধারাকে আরও সুন্দরভাবে, আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি এবং আরও ভালভাবে শিখি। ঔপন্যাসিকেরা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে কতখানি শিক্ষা দেন, তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন, এঁদের কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাঁদের জীবনযাত্রার উপর তাঁদের বিষাদবিধুর চিন্তা-ভাবনার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করি। এক অর্থে উপন্যাসকার হলেন আপনার যথার্থ দর্শনবেত্তা। অনেক পাত্রপাত্রী নিয়ে যদি একটা গল্প লিখতে হয় তাহলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে এবং প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকা দরকার। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর সবচেয়ে কম দার্শনিকচেতনা আছে বলে মনে হয়, তাঁর উপন্যাসের ঘটনা-পারম্পর্যের পরিকল্পনায়, পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি তাঁর আপন জগত সম্বন্ধে ধারণাটুকুকে রূপ দেন ; যখন আমাদের সমকালীন উপন্যাসকার হার্ডি, আনাতোল ফ্রান্স অথবা টমাস ম্যানকে আমরা দার্শনিক বলি, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের সমকালীন দর্শনশাস্ত্রীদের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধতর অর্থে দার্শনিক। তাঁরা তাঁদের চিত্রিত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে, আপন আপন ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সম্যক মূল্যায়নটুকু করে দেন। তাঁরা তাঁদের জীবনমূল্যায়নটুকুর যাথার্থ্য সমগ্র মানব-সমাজের অস্তিত্বের পটভূমিকায় নির্ণীত করেন। তাঁরা শুধুমাত্র মূল্যায়নই করেন না, তাঁরা নতুন এক জগতের সৃষ্টি করেন। সমসাময়িক দর্শনচিন্তায় আমরা এমন একটি জগতের আবিষ্কার করতে নিশ্চয়ই পারব না, যে জগত উপন্যাসকারের সৃষ্টি জগত থেকে পূর্ণতর এবং ব্যাপকতর। কারণ উপন্যাসিকের মন অনন্তে সংলগ্ন এবং তাঁর দৃষ্টি ও কল্পনা কালের বিস্তারের গভীরে প্রবেশ করেছে।

। ৪ ।

বিষয়বস্তু, দৃষ্টি ও দৃশ্যশিল্প

পৃথিবী সম্পর্কে শুধু আলোচনাই করা চলে না ; চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখতে হয়। কথা বলার জন্য শুধু যে আমাদের জিহ্বা আছে:তাই নয়, শোনার জন্য যে কান আছে তাই নয়, দেখার জন্য চোখও রয়েছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে আমাদের কান দিয়ে আমরা শুধু আনন্দের জন্য সঙ্গীত শ্রবণ করি না, শুধুমাত্র অর্থহীন শব্দ শুনি না যা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। আমরা প্রতীকী শব্দও শুনি। সে শব্দ তর্কশাস্ত্রসম্মত অর্থের ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। চোখের পক্ষেও বস্তুগুলি অর্থহীন সঙ্কেত বলে মনে হতে পারে, কোন একটি পুস্তকের পাতায় দেখা অর্থহীন অক্ষর-সমষ্টির মত। অথবা কোন একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বিশেষ ভাষায় লেখা দুর্বোধ্য আলোচনার মতও মনে হতে পারে পার্থিব বস্তুগুলিকে। মানুষের ব্যবহারগত বুদ্ধির মূল্যায়ন বস্তুগুলিকে প্রতীকশৃঙ্খল বলে মনে হয়। Vision & Design গ্রন্থে Roger Fry বলেছেন যে দিনমানে আমরা বস্তুজগতকে যেভাবে দেখি তাকে কোন ক্রমেই 'নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন' আখ্যা দেওয়া যায় না। আমাদের কাজের জন্য যেটুকু দেখা দরকার, কেবলমাত্র আমরা সেইটুকুই দেখি। শিল্পতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুতে কতটুকু রঙ, রেখা, রূপ ও গুরুত্ব রয়েছে, তা আমরা একেবারেই দেখি না।

রঙ এবং রূপের দ্বারা প্রায় সকলেই আকৃষ্ট হয়। মনস্তাত্ত্বিকেরা আমাদের বলেন যে আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়জ উদ্দীপনার উত্তর দিই পেশীজাত প্রতিক্রিয়া দিয়ে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এই প্রতিক্রিয়াটুকু অত্যন্ত দুর্বল। হয় কোন পেশীতে সামান্য আকুঞ্চন জাগে অথবা কোন স্নায়ুতন্ত্রীতে সামান্য

উত্তেজনা লক্ষিত হয়। চিত্রী অথবা ভাস্কর তাঁদের ইচ্ছা-শক্তি চালনা করে আপন আপন সংবেদনকে ক্যানভাসে অথবা মর্মর ফলকে রূপদান করেন। দৃশ্যশিল্পের গুণাগুণ বিচার করার সময়ে শিল্পের দৃশ্যগত মূল্যটুকু বিচার করা হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান যে শিল্পটি তার দ্বারাই শিল্পকর্মের বিচার হয়।

দৃশ্যশিল্পের মধ্যে দর্শনগত গুণাবলী ছাড়াও যে শিল্পের অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে, সে কথা আমরা শীঘ্রই আলোচনা করব। আমরা এই প্রসঙ্গে যে চোখের কথাই ভাবি না কেন তা নিশ্চয়ই কোন না কোন মানুষের চোখই হবে। এবং আমাদের চোখের সামনে যে কোন বস্তুই থাকুক না কেন তা গদ্য অথবা কবিতার কথার মত আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবে। ঐ যে রঙ, ঐ যে রূপ দেখছি, ওগুলো নিশ্চয়ই কোন বস্তুর রঙ ও রূপ ; ক্যানভাসের ওপর আঁকা ঐ যে 'পিরামিড' দেখা যাচ্ছে ওটা নিশ্চয়ই কোন পবিত্র যূথবদ্ধ পরিবার, ঐ যে উপবৃত্ত দেখছি, ওটি একটি মুখের ছবি, ঐ যে ছড়িয়ে পড়া লাল রঙ, ওকে আচ্ছাদনবস্ত্র বলে মনে করা যেতে পারে অথবা সূর্যাস্তের উজ্জ্বল আভা হিসাবেও ওকে মনে করা যেতে পারে। কোন একটি ছবির বিষয়-বস্তুকে মানুষের আবেগ-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। যে চোখ বিষয়বস্তু অবলোকন করছে তা হল মানুষেরই চোখ এবং মানুষের চোখ শুধুমাত্র দর্শনবিষয়ক মাধ্যমই নয়, এবং চোখের শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক আবহটুকুই আছে তাও নয়। চোখের এই বিকল্প ক্রিয়া এতই প্রবল যে অনেকের চোখেই চিত্র হল নিখুঁত দৃশ্যকাব্য। অবশ্য এঁরা কখনই ছবি দেখার শৈলীতে অভ্যস্ত হন নি এবং কখনো চক্ষু-ইন্দ্রিযকে সেই ধরনের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নি, যার ফলে চোখ শুধুমাত্র উপস্থিত বিষয়টুকুকেই দেখে এবং সেই দর্শন থেকে আনন্দ পায়। ছবির আনন্দ তার রঙ এবং রেখা থেকে আহরণ করতে হবে, ভাস্কর্যকর্মের আনন্দটুকু পেতে হবে শিল্পকৃতির আকার ও আয়তন থেকে, স্থাপত্য কর্ম দেখে আমরা আনন্দ পাব তার উপরিভাগের শিল্পকৃতি এবং গুরুত্বের পরিমিতিবোধে। স্থাপত্যকর্মের বেলায় প্রয়োজনবোধ তার নন্দনতাত্ত্বিক রসাস্বাদনের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে যায়। বাড়ি ঘরদোর দেখলেই তাকে প্রয়োজনের বিগ্রহমূর্তি বলে মনে হয়। একে কল্পনার সামগ্রী বলে বিবেচনা করতে দ্বিধা হয়।

ছবিকে ছবি হিসেবে দেখে তা থেকে আনন্দ পেতে হলে চোখের সারল্য

এবং তাৎক্ষণিক আবেদনে তার সাড়া দেবার শক্তিটুকু আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। অনেকের কাছেই আঁকা ছবি হল রঙিন ফটোগ্রাফ মাত্র; এচিং হল আর এক ধরনের ফটোগ্রাফি যার মধ্যে রেখাগুলি সূক্ষ্ম এবং সুস্পষ্ট রূপ নেয়। কিন্তু যাঁরা চিত্ররসিক মুখ্যতঃ তাঁরা শিল্পের এই প্রতিনিধিত্ব কর্মে বিশেষ আগ্রহশীল নন। তাঁদের আগ্রহ হল দর্শনে এবং এই দর্শনের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাওয়ায়। চিত্রকর্মে প্রধানতঃ রঙ ও রেখা এবং বিস্তারই মুখ্য। এক অর্থে কথায় চিত্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা বৃথা; যেমন বৃথা বাক্ রচিত Eugene। সঙ্গীতকে তর্কশাস্ত্রসম্মত সূত্রাকারে প্রকাশ করার চেষ্টা। রেখার ভাষা, বিভিন্ন রঙের সমন্বিত রূপের আবেদনই হল চিত্রের বৈশিষ্ট্য। কথার মাধ্যমে ছবির ভাষাকে ব্যক্ত করা যায় না। ছবি থেকে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা মিস্টিকের ঈশ্বর-দর্শনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়। একের প্রতিক্রিয়া অপরকে বোঝানো যায় না। চিত্র কর্ম আমাদের যে ধরনের আনন্দ দেয় তা হয়ত অন্যভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি—তার বেশি কিছু নয়। De witt Parker সুন্দর করে তাঁর 'Principles of Aesthetics' গ্রন্থে বললেন:

'It is most sufficient that the picture move us through the vicorious presence on a canvas of a moving object, it must stir us in a more immediate fashion through the direct appeal of sense. For example, a picture which presents us with a semblance of the sea will hold us through the power which the sea has over us; but it will not hold us so fast as a picture of the same subject which in addition grips us through its greens and blues and wavy lines. The one sways only through the imagination, the other through our success as well.'

অর্থাৎ চলমান কোন বস্তুর ছবি বলে মনে হলেই যথেষ্ট হল না; ইন্দ্রিয় পথে আরো সক্রিয়ভাবে আমাদের মধ্যে উত্তেজনাটুকু জাগাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সমুদ্রের ছবি দেখে মনের মধ্যে সমুদ্রের সেই অনন্ত শক্তিটুকুর প্রভাব অনুভব করা দরকার। কিন্তু ছবির মধ্যে সেই শক্তিটুকু

থাকে না যেটুকু মৌলিক বস্তুর মধ্যে থাকে। সমুদ্রের নীল, সবুজ রঙ আর তার সর্পিল ঊর্মিরেখায় আমাদের মনকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। ছবি শুধু কল্পনার মাধ্যমে আমাদের প্রভাবিত করে। ছবির বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়পথে সংবেদন জাগায়।'

বিভিন্ন রঙ-ও বিভিন্ন স্বরগ্রামের মতই স্পন্দনমাত্র; ইথারের ভিন্নধর্মী স্পন্দনের ফলেই বিভিন্ন রঙের জন্ম। বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ধরনের গুণ আছে এবং আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর তার কার্যকারিতাও ভিন্ন। বিশেষ ধরনের স্পর্শ, শব্দ ও ঘ্রাণ আমরা পেয়ে থাকি। এগুলি অদ্বিতীয় এবং রূপান্তর সহজসাধ্য নয়। অনুষঙ্গজাত বিভেদের কথা বাদ দিলেও রঙের বিভিন্নতার প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা আনন্দ এবং বেদনাবোধ করে থাকি। শব্দের মত রঙের মধ্যেও বৈষম্য থাকে। লাল এবং বেগুনী রঙের মত তীব্র উজ্জ্বল রঙ-ও আছে, আবার বিভিন্ন স্তরের মোলায়েম নীলচে রঙেরও অসদ্ভাব নেই। বিশেষ বিশেষ রঙ থেকে নির্বিশেষে রঙ্গন শিল্পের উদ্ভব করা হয়েছিল কিছুদিন আগে; নির্বিশেষ স্বরশিল্প—যাকে আমরা সঙ্গীত বলি তা এই রঙ্গনশিল্পের সমতুল্য। কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁদের ওপর রঙের বর্ণালীর সামান্য ভেদাভেদেও ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা বর্ণের সূক্ষ্মতর ভেদ সম্বন্ধেও অত্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল। একখানি সুন্দর ছবির কাছে তার আকর্ষণ বহুল পরিমাণে দ্রষ্টার বর্ণ-সংবেদনশীলতার ওপর নির্ভরশীল। শিল্পী যে পরিমাণে দ্রষ্টার প্রাথমিক বর্ণ-সংবেদনশীলতাটুকুকে কাজে লাগাতে পারবেন সেই অনুপাতে ছবির আবেদনেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে।

আমাদের সহজ অনুভূতিতে চোখে দেখে রঙ সম্বন্ধে যা মনে হয় তার সবটুকু সত্য নয়। রঙের সঙ্গে প্রীতিপ্রদ এবং অপ্রীতিকর বহু স্মৃতি এবং সংবেদন বিজড়িত থাকে। রক্তের সঙ্গে লাল রঙের, আকাশের সঙ্গে নীল রঙের, সূর্যালোক অথবা গ্রীষ্মকালের সঙ্গে হলুদ রঙের, কালো রঙের সঙ্গে শোকের, ধূসর রঙের সঙ্গে বিষাদের যোগটুকু সর্বজনবিদিত। অখ্যাতপথে আমাদের সংবেদনের সঙ্গে স্মৃতির একটি নিগূঢ় যোগ রয়েছে। তাই জন্যই কোন একটি ছবির রঙে আমাদের মনে অপ্রত্যাশিত রকমের তীব্র প্রতিক্রিয়া কখন কখন দেখা দেয়। রঙের যে নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন তার মধ্যে অনুস্যূত

হয়ে থাকে চোখে দেখা রঙটুকু এবং স্মৃতিপথে টেনে আনা সেই রঙের অতীত স্মৃতি—এদের উভয়েরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অনেকেই রঙ দেখে খুশি হন, যেমন সমুদ্রের, আকাশের, বালির রঙে, আদি-বলয়-বিলম্বিত মহাদৃশ্যের রঙের সমারোহে, বহুরূপীর বর্ণবৈচিত্র্যে আমাদের উল্লাসের অন্ত থাকে না। আমরা আত্মহারা হয়ে পড়ি, মনে হয় যেন অনন্ত সুরসমুদ্রে ডুবে গেছি। রঙ্গীন স্ফটিকাধায়ে যে বর্ণবৈচিত্র্য, দীপাধারে যে বর্ণসমারোহের প্রতিফলন, হীরাজহরতে যে বর্ণালীর লীলা তার মধ্যে দর্শক ডুবে যান। ছবির মধ্যে অবশ্য আমরা কোন একটি রঙকে অসংলগ্ন; একক হিসাবে পাই না; ছবির সমন্বিত রূপের মধ্যে তা একটা বিন্দুমাত্র; চতুর্দিকে তার রেখার বেষ্টন, এই রঙ রূপকে নির্দিষ্ট করে দেয়। ভিনিসিয়ান চিত্রে রঙের বাহারই হল চরম শিল্পমূল্য (উদাহরণ হিসাবে টিশিয়ান এবং টিনরেটোর উল্লেখ করছি), তবু সে রঙ কোন একটি বস্তুর রঙ। চিত্রের যে কাঠামো তার স্পন্দনটুকুকে আশ্রয় করেই রঙের মাধুর্য। সূর্যাস্তের ছবিতে রং দিয়ে দিয়ে রঙীন নকশা তৈরী করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়; অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে যে সমৃদ্ধতর বর্ণবহুল স্বপ্ন আমরা দেখি তাকে ছবির মধ্যে বিধৃত করে দিই এবং তা বহুল পরিমাণে বাস্তবের চেয়ে উজ্জ্বলতর রূপ পরিগ্রহ করে।

শিল্পীর রঙ ইন্দ্রিয়গোচর সমন্বয়টুকু শিল্পে আমদানি করে এবং এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছবির বিষয়বস্তুতে একধরনের আলো আর রঙ জুড়ে স্তিমিত সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি হয়। চক্ষুগ্রাহ্য পরিবেশের তারা অঙ্গ ও উপাদান। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে রঙ হল চিত্রের বহিরাবরণ, ছবির বিষয়বস্তু রেখার মাধ্যমে ফুটে ওঠে, রূপ পায়; এগুলি হল চিত্রের উপজীব্য। দর্শনকৃতিকে রঙের ঔজ্জ্বল্যে ঐশ্বর্যবান করে তোলা হয়, দর্শনের তীক্ষ্ণতা, শক্তি ও গভীরতার প্রসার সাধিত হয়। চোখ যখন দেখে, তখন সেই দেখার ভিতর দিয়ে ছবির মধ্যে সংহতি-সাধন করে। এই সংহতিটুকু আসে রূপ এবং আকরের মাধ্যমে; বিভিন্ন রেখার সমন্বয় এই রূপ ও আকরের আকর।

রঙের মত রেখারও বিশেষ আবেদন আছে। আমরা বলি যে সুন্দর জিনিষ দেখা অনেক সহজ। ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংগতি, বক্র রেখার সাবলীলতা, সরল সুনির্দিষ্টতা এরা সবাই এক হয়ে আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক

আনন্দকে উৎসাহিত করে। বিশেষ বিশেষ রকমের রেখা, ভগ্ন ও বক্ররেখা, সরল এবং তরঙ্গায়িত রেখা, বৃত্ত এবং উপবৃত্ত এরা সবাই সঙ্গীতের উচ্চ এবং নিম্ন স্বরগ্রামের মত, উজ্জ্বল এবং টিমটিমে রঙের সজ্জা মূল্যে আমাদের স্নায়ুগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অভাবিত সমন্বয় সাধন করে। সঙ্গীতের তালের মত ছবির রেখাগুলিও এক ধরনের সঙ্গীত বললেই হয়। রেখাচিত্রে রঙের বালাই নেই। ফ্লোরেণ্টাইন প্রমুখ চিত্র-শিল্পের অঙ্কন রীতিতে রঙের ব্যবহার গৌণ। যাঁদের কাছে চক্ষুগত ইন্দ্রিয়াবেদন অতিমাত্রায় সত্য, তাঁরা ছবির রেখা দেখে রেখার সঙ্গে সঙ্গে রেখাকে অনুসরণ করেন এবং ছন্দোময় সংযোগে যে নির্বিশেষ বস্তুটার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বাস করেন। অন্য সব নন্দনতাত্ত্বিক কৌশলের কথা বাদ দিলেও গোথিক শিল্পের সমোন্নত ঋজুতা, রেনেসাঁস শিল্পরীতির প্রলম্বিত সমতা, গ্রীক পুষ্পাধারের নৃতপরা রেখা-শ্রেণী অথবা প্রাচীন অঙ্কন-শিল্পের অনমনীয়তা—এসবই হল রসের আকর।

একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে চিত্রের রেখার মধ্য দিয়ে আমরা গতির সংবেদন, স্পর্শের সংবেদনটুকু পেয়ে থাকি। সমমর্মিতাবোধ এই কথাটির সাহায্যে অনেক নন্দনতত্ত্ববিদ্ চিত্রকর্মে এবং ভাস্কর্যকর্মের মধ্যে দ্রষ্টা যে আনন্দ লাভ করেন সেই আনন্দটুকুর উৎসের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সহমর্মিতাবোধকে 'Empathy বা Einfueblung বলা হয়েছে বিদেশী ভাষায়। এর দ্বারা আমাদের শরীরের একটী বিশেষ প্রবণতাকে বোঝানো হয়েছে। মনুষ্যদেহ আপন উত্তেজনা ও গতিশীলতার মাধ্যমে বাইরের জগতে দেখা বিষয়টার সম্যক অভিজ্ঞতাটুকু পেতে চায়। কল্পনায় আমরা ছবিটীর প্রত্যেকটি রেখার সঙ্গে সঙ্গে চলি; ছবির মধ্যে যদিও কোথাও তালভঙ্গ হয়ে থাকে তা হলে আমাদের চলার মধ্যেও তালভঙ্গ হয়; অনুভূতির মধ্যে যে ছেদ পড়ে, এ তালভঙ্গ তারই ফল। প্রবহমান তরঙ্গায়িত রেখা আমাদের উত্তেজনার প্রশমন করে এবং আমাদের অনুভূতি ও অর্ধ-উপলব্ধ নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আনন্দরসের সঞ্চার করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যেমন উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবন্ত বিগ্রহরূপ নিজেদের কল্পনা করি, তেমনি ধারা ছবির অথবা মর্মর ফলকের জীবন্ত রেখাগুলির মধ্যেও আমরা সাময়িকভাবে আমাদের অস্তিত্বটুকুকে কল্পনা করি। ভাস্কর্যকর্মে উপরোক্ত 'সহমর্মিতাবোধের'

প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে। 'ডিস্‌কাস্‌ নিক্ষেপকারীর' মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা তার গতি এবং স্থিতি এদুটোকেই আপন করে নিই। আমাদের পেশীতে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়, পেশী দৃঢ়পিনদ্ধ হয়ে ওঠে যখন আমরা মাইকেলেঞ্জেলোর গড়া কোন পেশীবহুল মূর্তির যন্ত্রনাকাতর অভিব্যক্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করি। একসময়ে ওয়াল্টার পেটার বলেছিলেন :যে সব সার্থক শিল্পই আপন আপন বিশিষ্ট উপাদান এবং আঙ্গিকরীতিকে পুরোপুরি কাজে লাগায়। ছবি দেখে আমরা যে আনন্দ পাই তার উৎস হল চক্ষুরীন্দ্রিয় এবং চোখের দরবারেই ছবির আবেদন এসে পৌছায়। সমকালীন সমালোচকেরা বিশেষ করে ছবির প্রাথমিক এবং দৃশ্যগুণের উল্লেখ করেছেন। এঁদের অন্যতম এ্যালকর্ট সি বার্নস্‌ তাঁর 'The Art in Painting' গ্রন্থে এই ধরনের কথা বলেছেন। ভাস্কর্য শিল্প সম্বন্ধেও এঁদের মন্তব্য খাটে। তর্কশাস্ত্রের রীতি মেনে বলা যায় যে সঙ্গীতের মত চিত্রও নির্বস্তু শিল্প বলে পরিগণিত হতে পারে। ছবিতে রেখা, রঙ ও আকার প্রমুখ উপাদান দ্রষ্টার আনন্দের আকর স্বরূপ। এরাই বোদ্ধা দর্শকের দৃষ্টি ছবির আত্যন্তিক মূল্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। শিল্প বিচারের এই প্রান্তিক দৃষ্টি-কোণ থেকে ছবিতে ম্যাডোনা অথবা একদল সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতির, এক ঝুড়ি ফল অথবা বাড়ি ঘরদোরের ছবি যা-ই আঁকা হোক, সবার মূল্যই সমান। ছবির শিল্প-মূল্য অথবা মনুষ্য-সম্বন্ধ সম্পর্কিত ভাবমূল্যের কোন ইতরবিশেষ হয় না। শিল্পসমালোচকের চোখে কোন চিত্রের অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক ছক অথবা ছবিতে ব্যবহৃত রঙের মানচিত্রটুকু অত্যন্ত মূল্যবান বলেই মনে হবে। ছবিতে কোন বিষয়কে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করেই একথা বলা চলে। সমকালীন চিত্রসমালোচনায় একদল প্রান্তিক মতবাদী রয়েছেন যাঁদের মতে ভবিষ্যতে শিল্পে কোন বিষয়কে বা বস্তুকে চিত্রিত করার প্রয়াস থাকে না ; শুধুমাত্র যা উপস্থাপিত করা হবে চোখের সামনে সেইটুকুই দেখা হবে ; মনোযোগ এবং কল্পনাকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য কোন বিষয়কে শিল্পে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হবে না। দর্শকের দৃষ্টি এবং চিত্রীর মনোযোগ যা দর্শনীয় তার প্রতিই থাকা উচিত, একথা বলাই বাহুল্য। অন্যথায় চিত্রকলা দৃশ্যকাব্যের দৃপ্তরূপে পর্যবসিত হবে মাত্র। বাইরের বস্তুর দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নেই ; ভিতরে যে দিবাস্বপ্ন বোনা হচ্ছে

তার দিকেই লক্ষ্য। যারা পড়তে শেখেনি, তারাও ছবি দেখে আনন্দ পেতে পারে। কিন্তু চিত্রকলা শুধুমাত্র নির্বস্তু রঙের ও রূপের আধার মাত্র হবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শুধুমাত্র এই ধরনের আধারে শিল্পকে যে পর্যবসিত করা যাবে না এর পিছনে নন্দনতাত্ত্বিক যুক্তি রয়েছে। আমাদের আগ্রহ ও স্বার্থ-জড়িত পরিচিত বস্তুই নন্দনতাত্ত্বিক আধাররূপে পরিগণিত হয়। ছবির কোন গুণের ব্যত্যয় হয় না যদি ছবির মধ্যে একটা আকর্ষণীয় মুখচ্ছবি আঁকা থাকে অথবা এমন একটি নিসর্গলোকের দৃশ্য আঁকা হয়ে থাকে যার মধ্যে দর্শক শান্তি, স্বাধীনতা অথবা আনন্দের সন্ধান পান। চিত্রী এবং দর্শকের এই সত্যটুকু সদাসর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্রমূল্য অর্জন করতে হবে। সাধারণভাবে যা মানুষের কাছে মূল্যবান তাকে রঙে ও রেখায় দর্শকের চোখে মনোরম করে তুলতে হবে। সাধারণ দর্শক যখন 'অভিযোগ করেন যে তিনি চিত্রে আঁকা 'সূর্যাস্ত' বা 'মানুষের মুখ' সত্যি সত্যি কখনো দেখেননি, তখন তিনি অনৃতভাষণ করছেন না। কিন্তু তিনি যে সত্যের কথা বলছেন তার দ্বারা তিনি চিত্রের শিল্পগুণের অপযশ করছেন না। ফটোগ্রাফিতে বিষয়কে যেমন হুবহু নকল করার চেষ্টা হয় শিল্পী নিশ্চয়ই সেই ধরনের চেষ্টা করেননি। তিনি আপনার শিল্প-মাধ্যমে বাহিরের পরিদৃশ্যমান জগতের কোন অংশকে চিত্রিত করতে চাননি ; তিনি চেয়েছেন প্রাকৃতিক জগতের অথবা মনুষ্যলোকের একটি ভাবচিত্র আঁকতে যা একাধারে চিত্তাকর্ষক হবে এবং সমগ্র কল্পনাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়াকে প্রকট করবে। যে রঙের বাহার প্রকৃতিতে দেখি না, তা নন্দনতাত্ত্বিক সমর্থন পেতে পারে। রেখার সমন্বয়ে এমন ভূচিত্র আঁকা যায় যা হয়ত সত্যই কোথাও নেই ; কিন্তু যে ভূচিত্র নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তবতায় ন্যূন হবে না যদিও সাধারণভাবে তাকে সত্য বলা চলবে না। ছবিতে আনুপাতিক পরিণতি আনতে গিয়ে অনেক সময় প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করতে হয়।

চিত্রকর প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন না, যেমন তর্কশাস্ত্রবিদ বাস্তবের প্রতিলিপি রচনা করেন না। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তবতা। শিল্পী যখন তাঁর শিল্পসৃষ্টির ইন্দ্রিয়জ স্বচ্ছতা এবং দর্শনগত আনন্দটুকুকে ক্যানভাস অথবা

পাথরের বুকে শাশ্বত করে রাখেন সেই মাহেন্দ্রলগ্নে আমরা নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তবটুকুর দেখা পাই। এই বাস্তবতাটুকুর সৃষ্টি হয় শিল্পীর রেখায় ও রঙে। শিল্পী যে রঙ ও রেখার সমন্বয় ঘটান তার যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাই ছবির গভীরতায় ও স্বচ্ছতায়, তার সৌন্দর্যরসে। তাই কোন মানুষের হুবহু নকল করা ছবিতে তার মুখসৌন্দর্যের সত্যটুকু প্রকাশিত না হতেও পারে। তার মুখমণ্ডলে স্থানে স্থানে হয়ত এমন সব রঙ শিল্পী আবিষ্কার করলেন, যে রঙটুকু হয়ত প্রকৃতি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। চোয়ালের পাশে হয়তো এমন একটা রেখা রয়েছে যার কোন ফটোগ্রাফিতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অল্প। তা সত্ত্বেও তাঁর ছবিটা বন্ধুদের খুবই স্পষ্ট এবং অর্থবহ বলে মনে হবে। যাঁরা তাঁকে দেখেন নি তাঁদের কাছেও ছবিটি অস্পষ্ট অর্থবহ বলে মনে হবে না। প্রকৃতি থেকে যেটুকু পার্থক্য দেখা যাবে, যেটুকু বিকার পরিলক্ষিত হবে তা শিল্পীর শিল্প-আঙ্গিকের অংশ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত; এই আঙ্গিকের সাহায্যে শিল্পী ছবিকে প্রস্তুতির প্রতিচ্ছবি করে গড়েন না; নন্দনতাত্ত্বিক অর্থে বাস্তব ও সুন্দর করে রচনা করেন।

ছবির উপজীব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তুজগতের প্রতিকৃতি নয়; ছবিতে এমন এক ধরনের সত্তা প্রতিষ্ঠা পায় যা কেবল চিত্রজগতেই সুলভ। সেই চিত্রে যে জগত, যে সুসংহত বিশ্বের সৃষ্টি হয়, তার মূলে আছে কবি-কল্পনার আলো, যে আলোয় অবগাহন করে শিল্পের বিষয়বস্তু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই জগতের কারণ-উপাদান হল সুসংহত সংগতি, রঙের, রেখার ও আকারের সমন্বয়; চিত্রী এই সংগতি, এই সমন্বয়টুকুকে ফুটিয়ে তোলার সাধনা করেছেন। রঙের রেখার ঐ ছোট্ট জগতটি বস্তুজগতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আকর্ষণীয় নয়; এ জগত স্বচ্ছ, সুসংহত ও আলোকোজ্জ্বল; এতে বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে, রেখা-সুষমা আছে, আর আছে শিল্পীর খেয়ালী মনের স্পর্শ, যে কোন ভিনিসীয় ছবিতে অথবা Giorgione-এর আঁকা ছবিতে এমন এক ধরনের কল্পনার আলো এসে পড়েছে, যে আলোয় ছবির বিষয়বস্তু এক অনির্বচনীয় ঐক্যসূত্রে গ্রন্থিত হয়ে গেছে। ফ্লোরেণ্টাইন শিল্পে এবং অন্যান্য সমকালীন শিল্পেও ছবির কাঠামোকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ছবি থেকে পৃথক করে দেখা যায়, এই কাঠামোটাকে ছবির শিল্প-সত্তার

মেরুদণ্ড বললে অত্যুক্তি হয় না। ছবি দেখে যে আনন্দ আমরা পাই তা হল শিল্পজাত আনন্দ, যা দেখেছি সেই দৃষ্ট উপাদানগুলির সমন্বয় মাত্র।

একথা বললে ভুল হবে না যে চিত্রণ-শিল্প হল একধরনের কাব্য, অথবা চিত্রণ-শিল্পেরও ছন্দ আছে। কিন্তু দৃশ্য-শিল্পের যে ছন্দ তা ছন্দোময় কথা থেকে স্বতন্ত্র। ছবিতে যে ছন্দটুকু পাই, যে কাব্যটুকু সন্ধান করি তা সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়। Wattaeu-এর গ্রাম্য পারিষদবর্গের উপস্থিতিতে ছবি রঙচঙে চিত্রময় কাব্যরূপে রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা সত্য নয়। ছবির রেখায় ও রঙে ঐ পারিষদেরা জীবন পেয়েছে, আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে ফুটে উঠেছে। ছবির যে কাব্য তা হল রেখা ও রঙ; এদের নিজস্ব কল্পনার অনুরণন সমগ্র শিল্পকর্মটুকু জুড়ে থাকে। দ্রষ্টার মধ্যে ছবি স্বপ্ন জাগায়, দ্রষ্টাকে সম্মোহিত করে তার আপন ভাষা, আপন ছন্দের সহায়তায়। সে ভাষা, সে ছন্দ হল চিত্রের, কাব্যের নয়। ঐ তরল নীল রঙ, লাল রঙ, ঐ ছায়াটুকু, এই সতেজ ঋজু রেখার বাঁধনছেঁড়া নির্দেশ, ঐ আয়তনের অতিনির্দিষ্টতা, এই সব উপাদানের মধ্যেই মুহূর্তের জন্য দর্শকের চোখ ডুব দেয়, কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়। রেম্‌ব্রাণ্ডের, এল্‌ গ্রেকোর, ফ্লোরেন্টিনীয় ব্রোন্‌জিনোর শিল্পকর্মের ছন্দ আমাদের মনে দিবাস্বপ্নের সঞ্চার করে। সেই দিবাস্বপ্নের ভাষাও হল চিত্রের ভাষা; সেই চিত্ররূপের অনুধ্যানটুকুও দৃশ্যমান বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

চিত্র সম্বন্ধে যা বলা যায় তা ভাস্কর্যকর্ম সম্পর্কেও একই অর্থে প্রযোজ্য। কিন্তু ভাস্কর্যশিল্পের একাধিক অঙ্গ রয়েছে যেগুলি বিবেচনা করলে একে চিত্র থেকে পৃথক করে বিবেচনা করতে হয়। সে পার্থক্যটুকু কেবলমাত্র শৈলীগত নয়। ভাস্কর্যশিল্পের বিষয়বস্তু হল মানুষের দেহ; নিজেদের দেহ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক এবং আমরা আমাদের দেহসৌষ্ঠবকে অত্যন্ত রমণীয় মনে করি এটাও সত্যি কথা। ভাস্কর্যকর্মের আবেদন তাই দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়জ রমণীয়তার আবেদন এবং পরিচিত প্রিয় পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে সচরাচর লভ্য নৈতিক মনোভাব, তর্কশাস্ত্রসম্মত অভিপ্রায় এবং কল্পনাশ্রয়ী অনুষঙ্গ—এদের দ্রষ্টব্য করে তোলার শিল্পপ্রয়াস। ভাস্করকৃত মূর্তি আমরা আগ্রহের সঙ্গে অবলোকন করি। তার ফলে ঐ মূর্তির উদ্যত পেশীমালার উত্তেজনাটুকু, আবার তার উত্তেজনাপ্রশমনোত্তর শান্ত ভাবটুকু সহমর্মিতা বোধের মাধ্যমে আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আমাদের মনে স্পর্শ পাবার

একটা আকাঙ্খা জাগে, আমাদের স্পর্শানুভূতি উদগ্র হয়ে ওঠে। এই ভাস্কর্যকর্ম আমাদের আকর্ষণ করে আপনার বীরত্বব্যঞ্জক মর্যাদাটুকুর:গুণে, অথবা নৈতিক ঐশ্বর্যে অথবা যৌবনকালের শক্তি-সৌন্দর্যের উন্মাদনায়। গ্রীকবীর, গ্রাক ব্যায়ামবীর অথবা গ্রীক দেবতাদের মতই এই আকর্ষণ অনিবার্য। ভাস্কর্যকর্মে মানুষের মন, তার ইচ্ছা, তার অভিলাষ, এরা সবাই দেহায়িত হয়; মর্মর পাথরে তৈরী মূর্তিটি শুধুমাত্র মর্মর মূর্তিই নয়; এটি হল পাথরে গাঁথা বিশেষ কোন মনুষ্য-আদর্শের ভাস্করকৃত রূপ।

এই কারণের জন্য এবং অন্যান্য কারণেও ভাস্কর্যশিল্প তার বিষয়বস্তুর এক বিশেষ ধরনের মর্যাদার দাবী করে। ভাস্কর্যশিল্প এখন এমন যুগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যখন মানুষের জীবন শ্রী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ এথেন্সের রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় জীবনযাত্রার ভাবগাম্ভীর্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও মানুষের দৈহিক সুষমা এবং এই দেহসৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে যাবতীয় রূপ-কল্পনাই হল ভাস্কর্যকর্মের উপজীব্য, তবু তার এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো চিত্রশিল্পে অলভ্য। একটি বিশেষ দিক থেকে ছবিকে বিচার করা হয়। একটি মূর্তিকে হাজার হাজার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। যে কোন দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন, ভাস্করকৃত মনুষ্যমূর্তি আকর্ষণীয় শিল্পসৃষ্টি। ভাস্কর্যকর্মে সচরাচর রঙের ব্যবহার হয় না। শিল্প-উপাদানের স্তূপ এবং উপাদানে রচিত রেখার ব্যঞ্জনার উপরই ভাস্কর্যকর্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে। উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যকর্ম আমাদের মধ্যে স্পর্শের প্রবৃত্তিটুকু জাগায়। ভাস্কর্যকর্মের (তা সে মর্মরের ওপরই হোক অথবা ব্রোঞ্জের ওপরেই হোক, মসৃণই হোক বা রুক্ষই হোক) প্রসাদগুণটুকুর নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনেক। নগ্ন মনুষ্যদেহ হল ভাস্করের শিল্পের বিষয়বস্তু। তাই আমাদের সভ্যসমাজে একে অসংলগ্ন নিন্দিত শিল্প বলেও এক ধরনের অভিমত রয়ে গেছে। যেখানে ভাস্কর্যশিল্প কোন বিশেষ নিদর্শন নিয়ে কাজ করছে, সেখানে ভাস্করের কানে বাজছে রেনেসাঁস যুগের সামান্য ধারনার অনুরণন; আর যখন ভাস্কর জাতিগত, সামান্যের প্রতিনিধিকে শিল্পের বিষয়বস্তু করেছেন তখন তাঁর শিল্পে গ্রীক শিল্পের বিশেষ-কেন্দ্রিক ব্যঞ্জনাটুকু ফুটে ওঠে। ভাস্কর্য-শিল্প সুন্দর হলেও, এ একটি মৃত সভ্যতার হিমশীতল স্মারকস্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু নতুন এক নৈর্ব্যক্তিক ভাস্কর্য-শিল্পের অভ্যুদয়ের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরসাস্বাদনের অন্তরশায়ী মৌল-তত্ত্বগুলির রূপায়নের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পাই স্থাপত্য-শিল্পে। স্থাপত্য-কর্মের যেসব বিজয়স্তম্ভ যুগে যুগে রচিত হয়েছে, স্থপতির নির্বাধ সৃষ্টিপ্রেরণায় যে স্থাপত্যশিল্প রচিত হল তার মধ্যে চিত্রশিল্পের রঙ ও রেখার অন্বয়, ভাস্কর্যকর্মের অলংকরণ ও চিরায়ত করার প্রয়াস এবং কাব্যের কল্পনাপ্রবণ ব্যঞ্জনা সমন্বিত হয়েছে। গোথিক উপাসনাগৃহে, গ্রীক মন্দিরে, আধুনিক যুগের মহাবিদ্যালয়গৃহের গম্বুজশীর্ষে অথবা সেতুবন্ধে আমরা সঙ্গীত ব্যতীত সকল চারুকলাব সুষমাটুকু এনে যুক্ত করি। এই সব বৃহৎ শিল্পকর্মের এক ধরনের স্থানিক বাস্তবতা ও তার আকর্ষণ রয়েছে যা অন্য শিল্পে একান্ত দুর্লভ। স্থাপত্যশিল্পী কখনো বিস্মৃত হন না যে তাঁর পরিকল্পিত গৃহের রূপ এবং ব্যবহার যোগ্যতা, এ দুটোই থাকা উচিত। অন্য শিল্পীদের এই বিবেচনাটুকু নেই। গৃহ শুধুমাত্র অলংকরণের আধার নয়; গৃহে ব্যক্তির এবং সমাজের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই প্রয়োজনই এর রূপটুকু নির্ধারণ করেছে।

স্থাপত্যশিল্প তাই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক; এবং প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের মধ্যেকার সীমান্তভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে সে এক বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। আমাদের পরিবেশের অংশরূপে তার মধ্যে নিত্যদিন স্থাপত্যশিল্প বিরাজ করছে বলেই আমরা ভুলে যাই যে এটি একটি বিশেষ ধরনের চারুকলা। মোলেয়ারের নাটকের কুশীলব Mr. Jourdain যেমন ভুলে গিয়েছিলেন যে সারাজীবন তিনি শিল্পের অন্যতমরূপ গদ্যশিল্পকে ব্যবহার করেছেন দৈনন্দিন প্রয়োজনে। আমরা সুন্দর কুৎসিত নানা ধরনের ঘরবাড়ির দ্বারা চতুর্দিকেই পরিবেষ্টিত। আমরা তাদের মধ্যে বাস করি। আমরা তাদের স্বীকার করে নিয়েছি। যদি কোন শিল্প পুরোপুরি আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে তা হল এই স্থাপত্যশিল্প। জাদুঘরে ছবিকে লুকিয়ে রাখা চলে। কবিতা না পড়লে, গান না শুনলে চলতে পারে কিন্তু ঘরবাড়ি, বিশেষ করে স্মারক ভবনগুলি চোখে পড়বেই। আমরা দৈনন্দিন কাজে কর্মে বেরোলেই তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন মন্তব্য করেছিলেন—চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদরা আপনার ভুলের চিহ্নমাত্র রাখেন না আর স্থপতিরা তাদের ভ্রান্তি-গুলি অনেক আয়াসে রচনা করেন।

আর এক অর্থেও স্থাপত্যশিল্প নিয়ন্ত্রিত। এটি ব্যয়বহুল শিল্প। স্থপতির

কল্পনাজাত পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া বিশেষ শ্রমসাধ্য। কবি গায়ক এবং চিত্রী এঁরা সকলেই অনেক কম উপাদান নিয়ে, অনেক কম পরিশ্রমে আপন আপন শিল্প সৃষ্টি করেন।

আমরা স্থাপত্যশিল্পকে দ্ব্যর্থবোধক বলেছি বলেই এমন কথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে স্থাপত্যশিল্পে সৌন্দর্যের শূন্যতা ঘটে না। পরন্তু এর ফলেই সৌন্দর্য উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। কোন একটি ভবনের ব্যবহারিক উপযোগিতা-টুকু ও তার যথাযথ আবেদন আমাদের কল্পনার দ্বারে পৌঁছে দেয়, এই সত্যটুকু স্থাপত্যসুষমার একটি বিশেষ দিককে উদ্‌ঘাটিত করে। কোন একটি ভবনের আকার, আয়তন অথবা রঙটুকুর জন্যই তার আবেদন সত্য হয়ে-ওঠে না, মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এটি কতখানি উপযোগী তাও কিন্তু আমাদের এই প্রসঙ্গে ভাবতে হয়। কন্‌স্তান্তিনোপলের মসজিদ, ন্যুইয়র্কের রেলস্টেশনভবন অথবা লয়রের গ্রাম্যভবনের সৌন্দর্য বিচার করার সময় এ কথা মনে হয় যে এদের সুষমা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, আমরা যখন এগুলোকে আশ্রয় করে যে জীবনধারা নিত্য-বহমান তার কথা চিন্তা করি।

কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে বাড়িটি সম্বন্ধে সর্বাগ্রগণ্য প্রাথমিক মত হল এই যে এটি দ্রষ্টব্য বস্তু। যে কোন দৃষ্টি-কোণ থেকেই দেখা যাক না কেন, ছবির মত এটি আগ্রহের উদ্রেক করে এবং ছবির মতই রঙে ও রূপে এটিও সার্থক হয়ে উঠে। স্থাপত্য-কর্মে রূপের সার্থকতা অনস্বীকার্য। অবশ্য রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় গীর্জার নিদর্শনকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। যে কোন ভবনের সৃষ্টি-পরিকল্পনার মধ্যে একটা ঐক্য নিশ্চয়ই থাকবে তবে সে ঐক্যটুকু বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে আমাদের মনোযোগকে নিত্য আকর্ষণ করবে। স্থাপত্য শিল্পের কোথাও অনাবশ্যক জটিলতা থাকবে না ; গ্রীক উপাসনাগৃহে, গোথিক প্রথায় নির্মিত ভবনের অভ্যন্তরভাগে আমরা যেমন নানাবিধ অলংকরণের মাধ্যমে গৃহের বিস্তার ঘটতে দেখি, সেই পথে স্থপতি তার নির্মিত ভবনের বিস্তার সাধন করলে সেই জটিলতাটুকু গ্রহণযোগ্য। স্থাপত্যকর্মের সৌন্দর্য নন্দনতাত্ত্বিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুটিকে উদগ্র করে তোলে। অলংকরণ ও গঠনের মধ্যে নিত্যদিন এই সৌন্দর্য ও মনোযোগের দোলা। যদিও একথা সত্য যে স্থাপত্যশিল্পে গঠননৈপুণ্যটুকুই মুখ্য। কেন্দ্রিক রেখা ও আয়তনের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য ভবন-গৃহটিকে গুরুত্বদান করে। বিশেষ ধরনের উৎকর্ষ-সন্ধানী

মনোযোগ হয়ত ভবনগৃহের অলংকরণকার্যের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে ; অবশ্য এই অলঙ্কারই ভবন-পরিকল্পনাকে ঔজ্জ্বল্য, বৈচিত্র্য ও মর্যাদা দান করে। Chartres-এ অবস্থিত গীর্জার তোরণদ্বারের ভাস্কর্যকর্মে অথবা রঙীন কাঁচের ওপর করা সূক্ষ্ম কারুকার্যে দর্শক-চিত্ত মুগ্ধ হয়। কিন্তু এই সব ভাস্কর্য মূলতঃ গীর্জার সম্মুখভাগের সামগ্রিক স্থাপত্য-পরিকল্পনার অঙ্গমাত্র। স্থপতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা বলা যায় যে গোলাপ-বাতায়নের রঙীন কাঁচের পাল্লার ওপর যে বর্ণ-বৈচিত্র্য, রঙের যে লীলা তা শুধুমাত্র ভবনের অভ্যন্তর ভাগের গভীরতাকে নির্দেশ করছে। গভীরতর ব্যাপ্তিতে তাকে প্রসারিত করছে। অলংকরণের প্রতি স্থপতির মমত্ববোধকে আমরা সুন্দর ঝঙ্কারময় শব্দের প্রতি কবির মমত্ববোধের তুলনা করতে পারি। স্থাপত্যের সামগ্রিক আবেদনকে তীব্রতর করার জন্যই স্থপতি তার ব্যবহার করেন। আবেদন-টুকুকে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে অলংকরণের ব্যবহার তিনি কখনই করেন না।

যে ভবনে অলংকরণ করা হয়, সেই অলংকারটুকু ভবনের গঠনশৈলীর দ্বারা বহুল-পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঐ ভবনের গঠনশৈলীও তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা নির্দিষ্ট। যে কোন ভবনের রূপমাধুর্যের অংশবিশেষ নির্ভর করে ভবনটি কী পরিমাণে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকু সাধন করছে তার ওপর। যে উদ্দেশ্যে ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার পূর্ণতা-সাধনই তার রূপবিকাশের পক্ষে প্রশস্ত পথ। ইয়োরোপীয় স্থাপত্যের মহৎ নিদর্শনগুলি দৃশ্যগত উপাদানের মাধ্যমে আপন আপন ব্যবহারিক উপযোগিতাটুকুকে প্রকাশ করছে। স্থপতির উদ্দেশ্য মূর্তি পেয়েছে এই সব স্থাপত্যের মাধ্যমে। গঠননৈপুণ্য ও পরিকল্পনায় মান্তুয়ার Palazzo del Te ভবনটি একটি প্রমোদ প্রাসাদ, এ্যামিয়েনের গীর্জাটি সুন্দর এবং পরিষ্কারভাবে পরিকল্পিত হলেও তা একটি উপাসনাগৃহ।

কোন ভবন নিশ্চয়ই শুধুমাত্র তার ব্যবহারিক প্রয়োগটুকুকে প্রকাশব্যাপারে প্রাধান্য দেবে না। যদি তা অবিমিশ্র স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই তার উপাদানের ধর্মকে প্রকাশ করবে। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে যে, স্থপতি যে পাথর এবং কাঠের বদলে ইস্পাত এবং লোহাকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ ও সচেতন। যখন ইস্পাতের কাঠামোয় গ্রীক গীর্জার

আদর্শে ব্যাঙ্কের ভবনটি নির্মিত হত অথবা পাথরের তৈরী রেনেসাঁস যুগের প্রাসাদের অনুকরণে এটির নির্মাণকার্য সাধিত হত সে কালকে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি। যে গৃহের স্থাপত্য-কৌশলে চক্ষু এবং কল্পনা উভয়েই প্রতারিত হয় সে ভবনের নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন বিরক্তিরই উৎপাদন করে।

ব্যাপকার্থে সুন্দর, গঠননৈপুণ্য ও পরিকল্পনায় নিখুঁত যে স্থাপত্যশিল্প তা উন্নততর সভ্যতার দ্যোতক। ফরাসীদেশের অসংখ্য প্রমোদভবন, প্রাসাদ ও গীর্জাকে ফরাসীরা আপনাদের সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন বলে যে উল্লেখ করেন, এটা খুবই সঙ্গত। আমরা স্বীকার করি, এগুলি যথার্থই ঐতিহাসিক কীর্তিস্তম্ভ। অন্য কোন কাজের চেয়ে গৃহনির্মাণ কর্মেই সামাজিক কল্পনা আপনাকে সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করে। কোন একটি জাতির স্থাপত্যকৌশল, স্থাপত্যকর্মে ব্যবহৃত অলংকরণ, এ সবই জাতীর রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করে। সঙ্গীত, পদ্য অথবা গদ্য রীতি—এদের কোনটিই স্থাপত্যের মত এতোখানি জাতীয় চরিত্রকে প্রকাশ করে না। সঙ্গীত-প্রমুখ শিল্পকলায় অযৌক্তিক, অবান্তর অথবা অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা চলতে পারে। স্থাপত্যশিল্পে তারা নিষিদ্ধ। গীর্জা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, রঙ্গালয়, প্রেক্ষাগৃহ, জেলখানা এ সবই হল সমাজ-জীবনের কেন্দ্র এবং সমাজজীবনের চিত্র এদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। উজ্জ্বল সূর্য-করোজ্জ্বল পর্বতোপরি গ্রীক দেবালয়, চতুর্দিকে বাসভবন পরিবৃত সু-উচ্চ গোথিক উপাসনাগৃহ, রেনেসাঁস যুগের প্রাসাদ এবং আধুনিক কালের গগনচুম্বী অট্টালিকা, এরা সবাই ইস্পাত, কাঁচ আর ঋজু সরলরেখার সমন্বয়। অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে স্থাপত্য শিল্পের এই নিদর্শনগুলি সভ্যতার মর্মকথাটুকুকে অধিকতর স্পষ্ট করে প্রকাশ করে। আমাদের জীবন-সত্তার প্রস্ফুটন ঘটে এই সব ভবনকে আশ্রয় করে ; এদের অলংকার, এদের গঠনগত ঐক্য, কল্পনাগত উপযোগিতার মাধ্যমে আমাদের জীবনধারার মান নির্ণীত হয়, আমাদের জীবন ধারা হয় নিয়ন্ত্রিত।

। ৫ ।

শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও গায়ক

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে শব্দ দুটি দিকে ধাবিত হয় এবং এর দুটি বিকল্প সম্ভাবনা আছে। শব্দ একদিকে প্রীতিপ্রদ, শ্রুতিসুখকর হয়েও ব্যাপক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। অথবা পুরোপুরি কোন বিশেষ ভাষাকে প্রকাশ করেও, প্রতীক অথবা সঙ্কেতের মালিকা রচনা করেও ভাষা হয়ত তার শ্রবণগত আবেদনে নিঃস্ব হতে পারে, অর্থের দিকে চেয়ে ভাষার ধ্বনিগত প্রসাদগুণটুকু একেবারেই অবহেলিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এমন একজনের কথা হয়ত বলা যেতে পারে যিনি কেবল লোকের কণ্ঠস্বরের এবং তাঁরা যে শব্দ বলেছেন তাদের ধ্বনিসুষমার দিকে মনোযোগ দিয়ে সারাটা দিন হয়ত কাটিয়ে দিবেন। অথবা হয়ত এমন দেশে গেছেন যেখানের মানুষের ভাষা তিনি বোঝেন না; তথাপি, সেখানের মানুষের ভাষার ঝংকারের দ্বারা তিনি সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারেন। শব্দ যখন অর্থ বহন করে, তখন তার নাম ভাষা। এই ভাষায় কাব্য, গদ্য লেখা হলে তখন তাকে বলি শিল্প। ভাষার শ্রুতি-সম্পদটুকু পুরোপুরি কজে লাগিয়ে আমরা সঙ্গীতসৃষ্টি করতে পারি। তর্কশাস্ত্রসম্মত অর্থে শ্রুতি-গুণের নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্ব, আবেগগত মূল্য অনস্বীকার্য।

অন্যান্য শিল্পের মৌলতত্ত্বের মতই সঙ্গীত-শিল্পেরও মূলতত্ত্ব একই। অন্যান্য শিল্পের মতই সঙ্গীতের মূলও সেই ইন্দ্রিয়জ আবেদন এবং সে-আবেদন নৈর্ব্যক্তিকও হয়, আবার কখন কখন বুদ্ধিগ্রাহ্যও হয়। সঙ্গীতের আবেদন অন্যান্য শিল্পের মতই প্রাকৃতিক বস্তুকে আশ্রয় করে। সুরের তীক্ষ্ণতা

বাতাসের কম্পনের ওপর নির্ভরশীল ; স্বরগ্রামে এর অবস্থান সুরের গুণাগুণ নির্ণয় করে ; স্বরের বর্ণ নির্ণীত হয় ঐকতানিক অবস্থানের সাহায্যে।

পাশ্চাত্যদেশীয় সংগীতের তান-বিন্যাস স্বৈরাচারের দ্বারা চিহ্নিত। অপেক্ষাকৃত নবীন কোন কোন সঙ্গীতের নিদর্শন দেখে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তান-নির্বাচন কতখানি স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এই স্বরগ্রামের মধ্যেই তান-সংযোগের অনন্ত সম্ভাবনাটুকু রয়েছে। সঙ্গীতের তান বিভিন্ন ধ্বনির মতই মনোরম হতে পারে। কথার ধ্বনিমূল্যটুকু ছাড়াও সঙ্গীতের আবেদনে কথাগুলির পারম্পর্যের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তা বিশেষভাবে সঙ্গীতের আবেদনকে প্রভাবিত করে। একথা আমরা জানি যে সংবেদনের মধ্যে স্মরণের অনেকটা উপাদান থাকে ; সঙ্গীতে যে কোন তানের আবেগময় আবেদনটুকু সঙ্গীতের মধ্যে তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। রঙের মতই তানগুলি আপন স্বভাবে হয় প্রীতিপ্রদ না হয় অপ্রীতিকর। এ ব্যাপারে অনুষঙ্গের কথাটা অবান্তর। তান কখন বা তীক্ষ্ণ তীব্র বেদনাদায়ক, আবার কখন বা মধুর কোমল বৈচিত্র্যের সঙ্গে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ারও বৈচিত্র্য ঘটে, অন্যান্য সংবেদনের মতই সুর-সংবেদন ও স্মৃতি এবং অনুষঙ্গকে জাগ্রত করে। কোন কোন সুরে ভেরী ধ্বনির আওয়াজের মত যুদ্ধের সংকেত ; বেহালা এবং বাঁশীর সুরে অপূর্ব কোমলতা। সংগীত-রচনায় যে তান ও ছন্দের অভাবিত সমন্বয় ঘটে তার মধ্যে বিভিন্ন সুরের পৃথক পৃথক অবদানটুকু খুব বেশী মাত্রায় প্রকট নয়। রাগিনী পৃথক ভাবে বিচার্য হলে তাকে আমরা কাল-বিলম্বিত তূর্যতন্ত্র মাত্র আখ্যা দিতে পারি। গানের একটি সুরে সঙ্গীতের সমগ্র সম্ভাবনাই অনুস্যূত থাকে এবং তা ক্রমে পূর্ণ হয়। সূক্ষ্ম সঙ্গীত রচনার সবটুকু ব্যেপে রয়েছে বিশেষ স্বরগ্রামে স্বরের ছন্দোময় প্রয়োগের সঙ্গে সুরকে যথাযথ যুক্ত করে দেওয়ার প্রয়াস। সঙ্গীত যতই জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, এর মধ্যে একক স্বর এবং সুরাশ্রিত বহু স্বরের সমন্বয়। স্বরগুলির মধ্যে শুধু যে সুরের সম্বন্ধটুকু বর্তমান তা নয়, কালিক অনুক্রমটুকুও সব নয় ; সমন্বিত হওয়ার মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গীবোধটুকু তাৎক্ষণিক বলে প্রতিভাত হয় সেটুকুও এর উপজীব্য নয়। সুরগুলি ছন্দকে আশ্রয় করে এবং কাব্যের মতই এর স্বভাব। সঙ্গীতের ছন্দই হল এর মৌল সম্মোহনী শক্তি এবং

হেতু সেই একই। ছন্দ আমাদের গান শুনতে সাহায্য করে; আমাদের বোধশক্তি অল্প আয়াসে ছন্দের জন্যই সঙ্গীতের রসটুকু গ্রহণে সমর্থ হয়। সুরগুলি ছন্দের মধ্যে ধরা যায় বলে তার আবেদন অনেক সহজ হয়। সহজ বুদ্ধিতে আমরা ছন্দের যেটুকু উপযোগিতা বুঝি তার থেকে অনেক বেশী উপযোগিতা রয়েছে সঙ্গীতের যতির মধ্যে। আমাদের শরীর-যন্ত্রের চারিত্রধর্মও ছন্দোময়। আমরা এমন এক ধরনের জীব যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মূল ভিত্তিটুকুও ছন্দোময়; কাজের মধ্য দিয়ে শব্দের যে ছন্দ নিত্য আমাদের অন্তরে প্রবেশ করছে তা আমাদের জীবনের ছন্দটুকুকে প্রভাবিত করছে। আমাদের চিন্তার মধ্যেও জোয়ার ভাঁটার ছন্দোময় উত্থানপতন নিত্য-লীলায়িত।

আমাদের চেতনার মধ্যে যে ছন্দ রয়েছে তা গীতিচ্ছন্দের আহ্বানে সাড়া দিতে সদা-উৎসুক। তালে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে তা আমাদের সমগ্র সত্তায় পরিবর্তন ঘটায়। ইউজেন ও-নীলের Emperor Jones-এ নিগ্রো নায়কের কাছে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের তাল ও মান একটা অদ্ভুত তীব্র আবেদন নিয়ে এসেছে। সমবেত সঙ্গীতে তাল ও লয়ের সূক্ষ্ম পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত সমজদার শ্রোতার কানে ধরা পড়ে। ভাগনারের প্রেমসঙ্গীতের উদার মাধুর্যের অন্তরে প্রিন্স আইগরের ছন্দোময় নৃত্যের তালটুকু যে মায়া রচনা করে তার ফলেই সঙ্গীতের আবেদন এতোখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। সঙ্গীতের সুরের এই রাজকীয় ঐশ্বর্যটুকু অন্যান্য শিল্পে নেই বললেই চলে। হয় আমরা গান শুনি না, আর না হয় যখন শুনি তখন এর ছন্দ, যতি, তাল এবং লয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি।

ছন্দটুকু সঙ্গীতের ভিত্তি হলেও, ওর প্রাণস্বরূপ হলেও, ছন্দই সঙ্গীতের সবটুকু নয়। ছন্দ হল সঙ্গীতের সাধারণ ধর্ম; এর বিশেষ ধর্ম এটা নয়। সুরের যে সূক্ষ্ম তন্তু বেয়ে শ্রোতার মন ছুটে চলে তাকে সঙ্গীতের বিশেষ ধর্ম বলতে পারি। ছবির যে সব রেখা ধরে দ্রষ্টার মন ছবির ভাবটুকুকে অনুসরণ করে তার চেয়েও গানের ভাবে মনের যে অনুপ্রবেশ তা অনেক বেশী অভিনিবিষ্ট এবং শক্তিমান। যখন গানের মধ্যে ডুবে যাই তখন তাল লয়ের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র সত্তাও নৃত্য করে। রাগিণীর মধ্যে একক এবং বিশেষ সুর যখন আপনাকে হারিয়ে ফেলছে,

তখন সেটুকুকেও আমরা আমাদের মধ্যে অনুভব করি। রাগিণীর ব্যাপ্তিটুকু নৈর্ব্যক্তিক ও স্থান-নিরপেক্ষ। কেবলমাত্র কালকে তা আশ্রয় করে। সেই সুর-মাধুর্যটুকু হল শ্রোতার. জীবন। সোপেনহয়রের বর্ণোজ্জ্বল রূপকথার ভাষায় বলি, সঙ্গীতের উত্তাল তরঙ্গান্বিত ছন্দের মধ্যে আমরা আমাদের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ইচ্ছাটুকুর প্রতিষ্ঠা করি।

সঙ্গীতের যে আনন্দ তার মূলে রয়েছে এই তাল, ছন্দ ও রাগিণী। এই তিনটিরই আবেদন ইন্দ্রিয়জ হতে পারে। কেউ কেউ আছেন যাঁরা অস্পষ্টভাবে অথবা বেশ পরিষ্কারভাবে সুরের নির্বস্তুজগতে বিচরণ করেন; বেহালা অথবা বাঁশীর সুরের বৈশিষ্ট্যটুকু তাঁদের কানে ধরা পড়ে। আবার কেউ কেউ রাগিণীর বিচিত্র পথে পথে ঘুরে বেড়ান। অন্য কেউ হয়ত সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের আবেদনের মধ্যে প্রচুর উত্তেজনা খুঁজে পান; তিনি বিচিত্র শব্দের সমন্বয়ের ঐশ্বর্যের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেন। সঙ্গীতের সংবেদনটুকু যতই জটিল হোক না কেন, সঙ্গীত শ্রবণে যে আনন্দটুকু আমরা পাই তা একেবারেই ইন্দ্রিয়জ আনন্দ হতে পারে। এই ইন্দ্রিয়জ আনন্দের কোন সীমা নির্দেশ করা যায় না। তবু এ কথা বলা চলে যে আমাদের কানের ওপর ধ্বনির যে রূঢ় আঘাত এসে লাগে তা থেকেও সঙ্গীতের আনন্দ জন্ম নিতে পারে।

যাঁরা সঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষিত তাঁদের কাছে গান শুধুমাত্র শব্দের আতসবাজি নয়। সঙ্গীতের রূপের ঐশ্বর্য দেখে যে বিচিত্র আনন্দ পাই তা বোধহয় অন্য কোন শিল্প থেকে পাওয়া সম্ভব নয়; সঙ্গীতের এই আনন্দটুকু বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং পবিত্র। সঙ্গীতের গঠন-জটিলতা সঙ্গীতের ভাষাতেই কেবল ব্যক্ত করা চলে। সঙ্গীত-মাত্রা কালাশ্রয়ী এবং এই সঙ্গীতের মধ্যে নানান ধরনের আবর্তন এবং সংবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। জীবনের মধ্যে অথবা মানুষের ভাষার পরিসরে এদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এদের ধর্মে বুদ্ধিগত উপাদানই প্রধান। সঙ্গীতের ভাবগুলি অন্তরঙ্গভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। বাকের Fugue সঙ্গীতের অন্তরে যে তর্কশাস্ত্রীয় বিচার নিহিত আছে তা আমরা সঙ্গীত গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই। নানাবিধ সুর-সংযোগের বিচিত্র পন্থায় গীতিকারের গাণিতিক প্রতিভা আপনাকে প্রকাশ করে; খুব কম তর্কশাস্ত্রবেত্তা আছেন যাঁরা ভাষায় সঙ্গীতোক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য

ভাবটুকুকে প্রকাশ করতে পারেন। গীত না হয়েও গীতি-রচনা দীক্ষিত সুরকারের কাছে গভীর অনুভবের বস্তু। সঙ্গীতের জগত প্লেতোনিক মহা-, ভাবের জগত; পারস্পরিক বিরোধের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এই ভাবগুলির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দার্শনিক সোপেনহয়র এই ধরনের চিন্তাই করেছিলেন যখন তিনি বললেন যে সিম্ফনি বা মিলিত সঙ্গীত হল জীবনের ও অস্তিত্বের পুরো দার্শনিক ব্যাখ্যা। সঙ্গীতের আকার হল নির্বস্তু (abstract); কেবল আপনাকে আশ্রয় করেই এই আকার থাকে; তবে এর জটিলতা, এর প্রাঞ্জলতা অস্তিত্বের অন্যান্য পর্যায়ের কোথাও গোচরীভূত হয় না। চক্ষুর মাধ্যমে যেসব ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাওয়া যায় তা থেকে যে সর্বাত্মক অনুমান আমরা করি তার নাম দেওয়া হয়েছে বহির্জগৎ। সঙ্গীতের মধ্যে যে ভুবনের সন্ধান পাই তা মূলতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়গত। যে সব প্রাণীর চক্ষু নেই তাদের ভুবনটুকু এই শ্রবণেন্দ্রিয়গত। গান শুনতে শুনতে সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছেন এমন একজন শ্রোতার কাছে ব্রাহ্মের সিম্ফনি অথবা মোজার্টের সঙ্গীত হয়ত সবটুকু সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু তবুও তা আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি ও কল্পনার বিশৃঙ্খল জগতটার চেয়ে অনেক বেশী অনুকূল, অনেক বেশী সত্য।

এমন কোন শিল্প নেই যে শিল্পে রূপের আনন্দ এতোখানি নির্মল হতে পারে। সঙ্গীত বেঁচে থাকে শ্রুতির জগতে, তা কল্পিত হয় শ্রুত অর্থে এবং ব্যঞ্জনায়। সঙ্গীতের দশভাগের নয় ভাগই হল স্মৃতি অথবা অনাগত ঘটনার পূর্বাভাসমাত্র। কোন না কোন এক মুহূর্তে আমরা যে গান শুনি তা কোন একটি বিশেষ সুর অথবা কতকগুলি সুরের সমন্বয়। সঙ্গীত বিদেহী এবং সময়ের ক্ষণিক বিস্তারকে আশ্রয় করে সঙ্গীতের ছন্দটুকু শ্রোতার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। সঙ্গীতযন্ত্রগুলি অবশ্য সবই বাস্তব উপাদানে গঠিত। অপার্থিব সঙ্গীতের উৎসভূমি হল কাঠ অথবা তামা দিয়ে তৈরী বাদ্যযন্ত্র অথবা কোন না কোন প্রকারের তারযন্ত্র। শ্রবণেন্দ্রিয় পথেই সঙ্গীতের আবেদন সত্য হয়। সমজদার শ্রোতার কানে সঙ্গীতের ইন্দ্রিয়জ আবেদনটুকু অপ্রাসঙ্গিক; অবশ্য এ থেকে তিনি আনন্দ পান। সঙ্গীতের মর্মলোকে রাগরাগিণীরা সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ সম্বন্ধে নিত্য আবদ্ধ। তারাই সঙ্গীত-রসধারার উৎস। কবি ও দার্শনিকের সমগ্র বস্তুজগতের অজস্র ক্রিয়াশীলতার প্রতিরূপ হিসেবে

ভূলোক সঙ্গীতের কল্পনা করেছেন। মহৎ ও সার্বিক সিম্ফনি বা ধ্বনি-সংগতিকে একটি বিশ্বজগতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই সঙ্গীতের জগতে শ্রোতা বিষয়সম্পত্তির ভাবনা থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পান ; নির্মল নির্বস্তু গণিতের জগতে সেইটুকু সময়ের জন্য তিনি অবস্থান করেন।

সঙ্গীতের অন্যতম রহস্য হল এই যে এই বিষয়হীন শব্দের জগৎ শ্রোতাকে এমন একান্তরূপে সম্মোহিত করে দেয় অথচ সঙ্গীতের মর্মের সঙ্গে বাইরের কোন বিষয়ের নিজের সম্বন্ধ থাকে না। এই সঙ্গীতশিল্পকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ কণ্ডুয়ন অথবা গাণিতিক আনন্দরূপে ব্যাখ্যা করা চলে না। অতিশয় প্রজ্ঞাবান শ্রোতার ওপর এবং ইন্দ্রিয়জ আবেদনে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল শ্রোতার ওপরেও সমভাবে সঙ্গীতের সার্বিক আবেদনের ক্রিয়া চলে। তাই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন। সঙ্গীত তার সবটুকু নির্বস্তু ও অর্থহীন চারিত্র-ধর্ম নিয়ে মানুষের আবেগজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এটা কী করে সম্ভব হয়, যে শব্দে দৃশ্যতঃ কোন অর্থই নেই সেই শব্দনিচয় সকলের চোখে মহৎ অর্থে অর্থবান হয়ে ওঠে অথবা বহুসংখ্যক শ্রোতার কানে তা অর্থবহ বলে প্রতিভাত হয়? এটাই বা কী করে সম্ভব হচ্ছে, যে শিল্প কোন অর্থেই ভাষা নয় তাকে সার্বিক ভাষা বলা হচ্ছে? অবশ্য অনেক সময় রূপকার্থে এর ব্যবহার হয় তা জানি। সঙ্গীতের সম্মোহনী শক্তিটুকু ছন্দমাত্রিক এবং এই ছন্দের আবেদনে আমরা সাড়া দিই আমাদের সর্বাঙ্গের আন্দোলনের মাধ্যমে কল্পনার সর্বাশ্রয়ী বিস্তার সাধন করে। সঙ্গীতের ছন্দে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়টুকুই সাড়া দেয় না। যদি আমরা মন দিয়ে গান শুনি, আমরা তখনি সঙ্গীতপ্রবাহে ভেসে যাই এবং এই প্রবাহের অঙ্গ বিশেষে পরিণত হই।

কিন্তু শুধুমাত্র ছন্দমাত্রার সহায়তায় সঙ্গীতের আবেগমুখর আবেদনটুকুকে ব্যাখ্যা করা চলে না। আমরা এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর De Witt Parker-এর সঙ্গে একমত যে সঙ্গীতের অন্তরঙ্গ আবেগপ্রদ আবেদন অংশতঃ গীতিকাব্য-ধর্মী এবং একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; অনন্ত জটিলতার মধ্যেও সংগীতের এই ধর্মটুকু অব্যাহত থাকে। সঙ্গীত হল মনুষ্যকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। বেহালায় সুর বাজে, গান হয় ; সবরকম সুরধ্বনির মধ্যেই রেশ নিহিত বলা চলে। অধিকাংশ সঙ্গীতেই আমরা সেই ঋজু অবিসংবাদিত ব্যক্তিগত আবেদনটুকু শুনতে পাই, যা একান্তভাবে মনুষ্য-ভাষার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে।

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ধরনের সংকট দেখা দেয় এবং যে ধরনের চিত্তবৃত্তি এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপজীব্য, তাদের সকলের প্রতিধ্বনি আমরা মাঝে মাঝে সঙ্গীতের মধ্যে খুঁজে পাই। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ মতিগতির সঙ্গে সম্বদ্ধ অনেক শব্দই বজ্রের মত কঠোর অথবা আপোষধর্মী হয়; কখন বা তা ভীতিপ্রদ হয়, আবার কখন বা তাকে পরম প্রীতিপ্রদ মনে হয়। এরাও সকলে সঙ্গীতের ব্যঞ্জনার মধ্যে স্থান পায়। সঙ্গীতে আমরা প্রকৃতির নানাবিধ ধ্বনির অনুকরণ করে থাকি; যন্ত্রসঙ্গীতেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বজ্রের গর্জন, বিহগের সঙ্গীত, নদীপ্রবাহের কলতান, ভেড়ার ডাক কিছুই এই অনুকরণ থেকে বাদ পড়ে না। কিন্তু এই ধরনের অনুকরণের মাধ্যমে আবেগমন্থর সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম সুরজাল বিস্তার করা যায় না। রাগিণীর বিস্তারে যদিও বিশেষ কোন বক্তব্য থাকে না কিন্তু অনির্দেশ্য পথে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রীরাজিতে। বাস্তবজীবনে আমাদের আবেগগত প্রতিক্রিয়া কর্মের রূপ নেয় অথবা কোন বিষয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। সঙ্গীতে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ হয় তা কেবল সঙ্গীতের মাধ্যমেই হতে পারে। সঙ্গীত আমাদের জাগ্রত করে, আমাদের উত্তেজিত করে আবার সে উত্তেজনার প্রশমনও করে। যে সুর, যে শব্দ আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগায়, তাই আবার মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

অবশ্য এক অর্থে সঙ্গীত আবেগ-প্রকাশের যোগ্য বাহন নয়। তান হল শুধুমাত্র তানই। তাদের কালব্যাপী পারস্পরিক সম্বন্ধটুকুই হল রাগিণী। একতান হল তান-নিচয়ের তাৎক্ষণিক সম্বন্ধটুকু। এরা কেউ-ই বলতে পারবে না যে কোন ভাষায় সঠিকভাবে ভাবটুকু প্রকাশ পাবে অথবা জীবনের কোন পরিস্থিতিতে কোন ভাবটুকু ব্যক্ত হতে পারে। সঙ্গীতকে এই ধরনের নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না বলে তার বিস্তারে এবং গভীরতায় আবেগের উদ্বেলতা। সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা সাধারণভাবে ভালবাসাকে দ্যোতিত করে যদিও তা বিশেষ কোন নর-নারীর ভালবাসা নয়; পূজা অথবা হতাশার কথা হয়ত সঙ্গীতে বলা হয়; কিন্তু কার পূজা, কেন এই হতাশা এ সব উহ্য থাকে। তাই সেই সঙ্গীতে হাজার হাজার শ্রোতা আপন আপন আশা ও অভিলাষের কাহিনীটুকু মিশিয়ে দেয়। হাজার হাজার ভিন্নধর্মী

আনন্দবেদনার কথায় উদগ্র হয়ে ওঠে সঙ্গীতের সুরে। কোন একটি বিশেষ সঙ্গীতসৃষ্টিতে কোন এক বিশিষ্ট ধরনের আবেগবিহ্বল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় না বলে, বিভিন্ন ধরনের শ্রোতার মনে এই গান শুনে আপন আপন মনের ভার লাঘব করা সম্ভব হয়। আমাদের কথা বড়ই পরিশীলিত এবং ভঙ্গুর; জীবন বড়ই গতানুগতিক ও রীতিবদ্ধ; তাই এদের মাধ্যমে মানুষের আবেগগত জীবনের প্রতিক্রিয়া নিঃশেষিত হয় না। সঙ্গীতের বহুবৈচিত্র্য সূক্ষ্মভেদ-সম্ভাবনা এবং জটিলতা বিভিন্নধর্মী শ্রোতার কানে বিভিন্ন ভঙ্গীতে কত বিচিত্র কথা বলে; সে কথা বলার ভঙ্গীতে কত না বৈরাগ্য, কত না গভীর অন্তরঙ্গতা। কোন মনুষ্যভাষাই এই বৈচিত্র্যটুকু প্রকাশ করতে পারে না। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই সঙ্গীতের এই বৈচিত্র্যের স্বাদটুকু দিতে একান্তই অপারগ।

শব্দের এই শিল্পায়নটুকুকে প্রথম দৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ত মনে হলেও সূক্ষ্মতর অনুসন্ধানে আমরা বুঝি যে এটির প্রকৃতি অত্যন্ত পরিশীলিত এবং গাণিতিক কল্পনার দ্বারা পরিকল্পিত; এর মধ্যে তীব্র ইন্দ্রিয়জ আবেদনের সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সংযুক্ত; সমাজ এবং জীবনের উপরে এর প্রভাব অভাবিত। আপন স্বাধীনতায় এবং নিয়ন্ত্রণে সঙ্গীতকে আমরা সভ্যসমাজের 'শব্দ ব্যতিক্রম' (Anagram) বলতে পারি। বুদ্ধিগত গঠন-নৈপুণ্যে এবং ভাব প্রকাশে সঙ্গীতে এমন এক ধরনের মার্জিত বিচারবুদ্ধির প্রভাব মেলে যা যে কোন সমাজে একান্তই দুর্লভ; অকথিত অথচ নিবিড়ভাবে দ্যোতিত সূক্ষ্ম আবেগটুকু প্রকাশ করে সঙ্গীত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্থূল অনুভূতি ও আশ্লেষকে একেবারে অর্থহীন করে দেয়। প্লেতো দর্শনকে সূক্ষ্মতর সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন নি। তাঁর মতে পরিশীলিত সুরবোধ মানুষের শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং পন্থা। কথাটা অদ্ভুত শোনায়। যে মন সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় আকৃষ্ট হয়, যে কল্পনা সঙ্গীতের সূক্ষ্ম আবরণে উদ্বেল হয় তারা কখনই মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদানে স্থূল অভিব্যক্তির প্রশ্রয় দেবে না। নৈতিক রুচি ও সঙ্গীত-আসক্তি, এরা একেবারেই যে অসম্পৃক্ত তা নয়। পরিণত সভ্যতায় মানুষের ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যবোধ, তার আবেগ-কোমলতা এবং তার বুদ্ধিগত শৃঙ্খলাটুকু সঙ্গীতের সর্বোত্তম এবং মহত্তম নিদর্শনের মধ্যে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

। ৬ ।

ললিতকলা ও দর্শন

শিল্প-দর্শন সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা করতে হলে শিল্প এবং দর্শন এতদুভয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধটুকু নির্ণয় করা প্রয়োজন। বাহ্যত দার্শনিক এবং শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর; শিল্পীর বিবেচ্য হল শিল্প-উপাদানের আনুকুল্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, শিল্পরূপ থেকে আনন্দ আহরণ ও আবেগপ্রতিধ্বনির আকর্ষণীয়তা। দার্শনিকের উদ্দেশ্য হল তর্কশাস্ত্রসম্মত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বিষয়সমূহের আবেগরঞ্জিত নিরুত্তাপ আলোচনা করা; সামান্য এবং নির্বিশেষ ভাবই দার্শনিকের আলোচনার উপজীব্য। শিল্পী সুন্দরের উপরতলার খবর রাখে, দার্শনিক সত্যের বিশ্লেষণ করেই তৃপ্ত। তাদের আঙ্গিক, তাদের ভাষা, তাদের আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই পরস্পরের থেকে একান্তরূপে পৃথক। তবে কবি ও শিল্পীর মধ্যে অন্ততঃ এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে উভয়েই কথার ব্যবহার করে। তবে একজন একটা বিশিষ্টরূপকে বোঝাবার জন্য আবাহন-মূলক শব্দরাজির ব্যবহার করেন; অন্যজনা সামান্য নির্বিশেষ ভাবটুকু দ্যোতিত করার জন্য অথবা কোন অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকট করার জন্য যে ভাষার আশ্রয় নেন তার মধ্যে রঙ নেই, চাকচিক্য নেই। শিল্পীরও সৃষ্টি-ন্যায় রয়েছে তবে তা শিল্প-উপাদানগুলিকে সুসংহত করার অথবা শিল্পীর বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিগুলিকে সমন্বিত করার পদ্ধতি মাত্র। চিন্তাবিদের নির্বস্তু আভ্যন্তরীন তর্কপদ্ধতির সঙ্গে শিল্পীর ন্যায়ের অনেক প্রভেদ। দর্শন এবং শিল্পের মধ্যে এক ধরনের নৈতিক বৈরিতা রয়েছে বলে মনে হয়। কবি কীটসের সমগ্র কাব্য জুড়ে সৌন্দর্যের যে সূক্ষ্ম নমনীয়তা বিরাজিত তা কবি-মানসের সত্য ধারণা থেকে জাত; দর্শনের বিচারগত শৃঙ্খলা-বোধটুকু সব

রকম মানসপ্রক্রিয়া থেকে অনুপস্থিত হলেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় বিবাগী শিল্পকর্মের বৈরাগ্যে। শিল্পী বিচারগত ধারণাশ্রয়ী সূত্রগুলি সম্বন্ধে সঙ্গত ভাবেই সন্দিহান; তাঁর কাজ হল কল্পনাজাত রূপের সৃষ্টি; সে রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চিন্তাবিদ অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে কৃপার চোখে দেখেন; চিন্তার সঙ্গে আবেগকে যুক্ত করার তিনি পক্ষপাতী নন। তিনি চিন্তার সাংগঠনিক আকারের প্রতি আগ্রহশীল, সে-আকার সত্যাশ্রয়ী। কবি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে; দার্শনিকের দৃষ্টিও বিষয়াশ্রয়ী। তবে তাঁর চিন্তার প্রান্তিক বিষয়টুকু হল অনন্ত সত্তা অথবা আপন চিন্তার বিভিন্ন সূত্রের সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ।

কিন্তু শিল্প ও দর্শনের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্বেও শিল্প ও দর্শন চিন্তার মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে; একে অপরকে দ্যোতিত করে। শিল্পী যখন শুধু মাত্র কুশলী কারুকার নন, তখন তাঁর বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, শিল্প উপকরণের যথাযথ মনোনয়নে, তাঁর শিল্পকর্মের পূর্ণাঙ্গ প্রতিক্রিয়ায় তিনি জীবনের ও জগতের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি তাঁর কল্পনাশ্রয়ী পন্থায় একজন যথার্থ দর্শনবেত্তা। দার্শনিক সংজ্ঞা এবং প্রমাণকে আশ্রয় করে, উদ্ভাবন এবং সমন্বয়ের পথে জীবন এবং জগতকে যেভাবে দর্শন করেন তাকে সবটুকু অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আঁকা একটি ছবির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, বুদ্ধি-আশ্রয়ী একটি রাগিণী অথবা কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা চলতে পারে যদিও এই দার্শনিক আলোচনার ভাষা হল গল্পের ভাষা। প্লেতো-সৃষ্ট সক্রেটিস চরিত্রের মুখে আমরা শুনি, দর্শন হল সূক্ষ্ম সংগীত; এই গুরু-গম্ভীর সঙ্গীত নিত্য জঙ্গম, যদিও এর উৎস-ভূমি দার্শনিকের যে মন তা একেবারেই অনড়।

শিল্প এবং দর্শনের সৌসাদৃশ্যের কথা বাদ দিলেও দার্শনিক শিল্পকে অথবা শিল্পীকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না কেন না দার্শনিককে সামগ্রিক চিন্তার আশ্রয় নিতে হয়। দার্শনিক যে বিচারটুকুর অনুধাবনে নিত্য যত্নবান এবং যে প্রজ্ঞাটুকুকে তিনি আবিষ্কার করেন এই সৃষ্টির মধ্যে, শিল্পীও তাকেই খুঁজে ফিরছেন তাঁর আপন ছোট্ট সৃষ্টির ভুবনে আপনার শিল্প-উপকরণটুকুকে আশ্রয় করে। শিল্পীর সৃষ্টির জগতে আমরা দার্শনিকের চিন্তা-শৃঙ্খলার প্রতিমাকে দেখি; দার্শনিক এই চিন্তা-শৃঙ্খলাটুকুকে বিশ্বজগতে প্রত্যক্ষ করার জন্য সকরুণ প্রয়াস করে চলেছেন। শিল্প দার্শনিকদের সম্বন্ধ

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ দার্শনিক যে শৃঙ্খলাটুকু প্রদর্শন করার জন্য যত্নবান শিল্পীর শিল্পকর্মে তারই প্রতিষ্ঠা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে প্রজ্ঞার নিদর্শন রয়েছে শিল্প তারই অনুকার। অবশ্য আর একটি কারণেও শিল্প দার্শনিকদের মনোযোগের বস্তু। শিল্পে নীতি, সত্য, জ্ঞান এগুলি সম্বন্ধেও যেসব সমস্যার অবতারণা করা হয় কোন দার্শনিকই তাকে অবহেলা করতে পারেন না।

আমরা জানি যে নৈতিক বিচারে দার্শনিকেরা শিল্পকে একটি বড় সমস্যা বলে বিবেচনা করেন। দার্শনিকেরা এ সমস্যাটিকে নিয়ে বিব্রত। বিশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অথবা চিন্তাপ্রণালীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাধারণতঃ আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত যে জীবন, আবেগের যে প্রভাব তার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা প্রয়োজন। যে কোন নৈতিক পরিকল্পনার বিবেচনা-কালে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা দরকার এবং যে কোন নৈতিক পদ্ধতির সংজ্ঞাদানের সময়েও এদের যথাযথ মর্যাদা দান করা আবশ্যক। ভালই হোক আর মন্দই হোক জীবনে এদের প্রভূত প্রভাব এবং মানুষের প্রবৃত্তিগত জীবনের উপরও এদের প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। ইন্দ্রিয় এবং আবেগ সম্পর্কিত আলোচনা তাই আবশ্যিক বিষয়রূপেই দর্শনশাস্ত্রের উপজীব্য হয়েছে।

দার্শনিক প্লেতো প্রমুখ দর্শনবেত্তাগণ তাই শিল্পকে নৈতিক শৃঙ্খলার উপায় এবং উৎসরূপে কল্পনা করেছেন। শিল্পকে অবশ্য সন্দেহের চোখেও দেখা হয়েছে; যখনই কোন দার্শনিক আত্মাকে জীবদেহের উপরে স্থান দিয়েছেন, অধ্যাত্মবিদ্যাকে দেহতত্ত্ববাদের উপরে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি তখনই চারুকলা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন; অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় নীতি-বাগীশের বেলায় এইটাই ঘটেছে। শিল্পের রহস্যে যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা পুরোপুরি এ থেকে রস গ্রহণ করতে পারেন। তাই সাধারণের এবিষয়ে আগ্রহের অন্ত নেই। শিল্পী সাধারণ মানুষের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করেন, তার চারিত্রিক দার্ঢ্য সহজেই শিল্পী ক্ষুণ্ন করে দিতে পারেন বলেই অনেকের বিশ্বাস। খ্রীষ্টীয় ও অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধনতন্ত্রে বিশ্বাসী নীতি-দার্শনিকের দল এঁদের দলে আছেন; মহাদার্শনিক প্লেতোও এঁদেরই দলে দলী যখন তাঁকে আর আমরা সম্মোহিত ও সম্মোহনকারী কবি বলে মনে করতে পারি না। তিনিই এঁদের প্রজ্ঞাবান প্রবক্তা। গতানুগতিক কৃচ্ছ্রসাধনবাদীদের সন্দেহটুকু সম্বন্ধে আর কোন আপত্তিই চলল না যখন

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের দ্বারা এই সন্দেহ সমর্থিত হল। চারুকলার মধ্যে যে যৌন আবেদনের অনুরণন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যৌন আবেদনের যে প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া শিল্পের অন্তরশায়ী, তাকে অস্বীকার করা চলে না; শিল্পের রূপ এবং উপাদানের মধ্যে যৌন অভিলাষের যে প্রচ্ছন্ন লীলা চলে, যৌন আবেগের যে রূপান্তর ঘটে নন্দনতাত্ত্বিক প্রয়াসে এসব কথা মনঃসমীক্ষকদের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল। গোঁড়া নীতিবাগীশদের সন্দেহ সমর্থিত হল মনঃসমীক্ষকের গবেষণায়; এই সব তথ্য থেকে যে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন, এ কথা সত্য যে প্রাচীন গোঁড়ানীতিবাগীশ এবং আধুনিক মনঃসমীক্ষকের মধ্যে এই সব তথ্যের নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত রইল না।

শুধু মাত্র দেহ এবং আত্মাকে কেন্দ্র করে এই বিবাদ আবর্তিত হয়নি; বিবাদের হেতু অন্যত্র রয়েছে। 'রিপাব্লিক' গ্রন্থের শেষে সক্রেটিস কেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবিকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করলেন? এর পূর্বে ত কবিকে তিনি মাত্র নিন্দা করেছিলেন। প্লেতো কিন্তু একথা ভাবেন নি যে শিল্পী শুধুমাত্র আমাদের পশুসত্বাটাকে জাগিয়ে তোলে; তিনি কবির নিন্দা করেছেন কেন না কবিরা মানুষের মনকে বিপথগামী করে। বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মোহে মানুষকে মুগ্ধ করে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপটুকুকে অনুকারের আশ্রয়ে আবার কবি নতুন করে বিন্যাস করেন। আর এই বস্তুরূপটুকু আবার হল প্লেতো-কল্পিত Idea বা মহাভাবের ছায়ামাত্র। মানুষের বুদ্ধি যে সৌধ গড়েছে তার নির্মাণে ইন্দ্রিয এবং চিন্তা কতখানি অবদান রেখে গেছে সে সম্বন্ধে বহুদিনের পুরানো একটা মতভেদ রযেছে। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প-দেউলের পূজারীদের সম্বন্ধে, কারুকারদের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে; তাঁদের শিল্প-উপকরণ ও শিল্পের বিষয়বস্তুই এই সন্দেহের অবকাশটুকু দিয়েছে। দর্শনেতিহাসে বারবার এর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। যখনই প্রজ্ঞাবাদীরা শিল্পের সমর্থনে কিছু বলেছেন তখন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে আমরা শুনেছি শিল্পের উপকরণ এবং শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সেইসব অপরিবর্তনীয় আকার অথবা সত্তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যে সত্তা পরিদৃশ্যমান সুন্দর ভুবনের অন্তরালে আপনাকে গোপন করে আবার কখন বা চকিত আলোকে আপনাকে প্রকাশ করে। প্লেতোর Symposium-এ আমরা শিল্প সম্বন্ধে এই ধরণের অভিমত পেয়েছি।

দেহ এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মন এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আমারা দার্শনিকদের শিল্প-সমালোচনার সূত্রটুকু খুঁজে পাই। অবশ্য এই ধরনের দ্বন্দ্ব-উৎসের প্রেরণাকে অস্বীকার করেও বলা যায় যে দার্শনিক শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন না। এর একটি অন্য কারণও আছে। যে সব দর্শন আকারসর্বস্ব ন্যায়শাস্ত্রে অথবা পরাবিদ্যায পর্যবসিত না হয় তারা অবশেষে নীতিশাস্ত্রের আকার গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্র, তা সে তার উৎস যা-ই হোক্ না কেন, তার লক্ষ্যে যাই থাকুক না কেন, সে যে কোন ধরনের অনুশাসনই প্রয়োগ করুক না কেন, নৈতিক অথবা সৎ জীবনেব বিশ্লেষণ ও বিবেচনাই তার উপজীব্য। নৈতিক জীবন, সৎ জীবন হল ইহলোকের জীবনধারার ভবিষ্যতের কার্যসূচী মাত্র; অবশ্য তা পরলোককেও দ্যোতিত করতে পারে। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য নীতিসম্মত সৎ জীবনের ধারনার প্রয়োজন; এই ধারণাটুকু আমাদের অশুভ ও অসৎ জীবনচর্যা থেকে মুক্তি দেয়, কল্যাণের স্পর্শে আমরা ধন্য হই। ইহজীবনে সুখলাভ করি, পরজীবনে মোক্ষের প্রত্যাশা রাখি। মার্কামারা সুখবাদীদের কথা ছেড়ে দিলে এ তত্ত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্য যে কল্যাণের ধারনাটুকু সর্বতোভাবে ভবিষ্যৎ জীবনকে আশ্রয় করে আছে; এই ক্ষণস্থায়ী ভবিষ্যৎ কালের অঙ্গীকারটুকু সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অধিকাংশ দর্শনমতকেই সুখবাদীদের বিরুদ্ধ স্টোয়িক মতবাদ প্রভাবিত করেছে; সুখান্বেষণ নয়, কর্তব্য-পালনই মানুষের প্রধান করণীয় ও নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। সমাগত বর্তমানের পরিবর্তে দূরাশ্রয়ী ভবিষ্যৎ, এই মুহূর্তের দাবীর চেয়ে অতীতের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি এই কর্তব্যের স্বরূপটুকু নির্ণয় করেছে।

শিল্প উদাহরণের সাহায্যে অথবা ভাবেভঙ্গীতে এই তত্ত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে জীবনের প্রাপ্যবস্তুটুকু বর্তমান কালাশ্রয়ী। এই প্রাপ্তি সম্ভব হয় ইন্দ্রিয়জ আনন্দের পাদপীঠে, আমাদের মনের আবেগমুক্তিতে। মুহূর্তের আনন্দকে চিরায়ত করার নামই হল শিল্প; শিল্পের আনন্দটুকুই শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, তা সে আনন্দ যত সূক্ষ্মই হোক্ না কেন। শিল্পে এই আনন্দের ভূমিকাটুকু এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে দার্শনিক সান্তায়ন শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন— শিল্প হল আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ। জগতে আমাদের দায়িত্ব অনেক,

অনেক কর্তব্য সমাধানের গুরুভার আমাদের স্কন্ধে; তাই শিল্প আমাদের জীবনের খানিক পলায়মান মুহূর্তগুলিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দানে প্রয়াসী হয়; এই মর্যাদা দানটুকুর কোন আত্যন্তিক উদ্দেশ্য নেই। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে নীতিবিদ শিল্পকর্মকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, শিল্পের আনন্দকে চিত্তবিক্ষেপ বলে ভাবেন এবং শিল্প-কমনীয়তা থেকে জাত সুখ-বোধকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি বলে গণ্য করেন। Walter Pater এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি নয়, অভিজ্ঞতাটুকুই লক্ষ্য।

নীতিশাস্ত্রের দ্রাক্ষাকুঞ্জে যে কর্মীটি আগ্রহ সহকারে কাজ করছেন তিনি ফল আশা করেন। কিন্তু মনুষ্যকর্মের একটি মূল্যবান নিদর্শনকে খেয়ালী অনুজ্ঞার দ্বারা নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না; দার্শনিকের কৃতিকেও অস্বীকার করা চলে না। যখন তাকে নস্যাৎ করার যুক্তি আমরা খুঁজে পাই তখনও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বেঁচে থাকে। যাঁরা দর্শনচিন্তায় তন্ময় হয়ে আছেন তাঁদের চোখে এর অস্তিত্বের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। ভালোর জন্যই হোক আর মন্দের জন্যই হোক, দার্শনিকেরা আপন আপন দর্শন-ব্যবস্থার মধ্যে বহু নিন্দিত ও নির্বাসিত শিল্পের জন্য একটু স্থান করে রেখেছেন। ইন্দ্রিয় মন ভোলায়, কল্পনা দর্শকের মত বদলায়; তবুও নীতিশাস্ত্রবিদেরা ইন্দ্রিয় এবং কল্পনা উভয়কেই আপন আপন মর্যাদায় নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাধকপ্রবর সেণ্ট অগস্টিন যখন গার্হস্থ্য-আশ্রম ত্যাগ করেন তখন তিনি অলংকারশাস্ত্র এবং সৌন্দর্য—এতদুভয়কেই পরিত্যাগ করেছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনি অলংকারশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সৌন্দর্যের পক্ষে ওকালতি করার জন্য। সুন্দরের সীমায়িত রূপদর্শনের মধ্যে সেই অলক্ষ্য মহারূপের দর্শন মেলে এবং এই পথেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেণ্ট বোনাভেঞ্চুরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভগবদ্ বচনের ভাষারূপে কল্পনা করেছিলেন এবং সন্তদের কল্পনা করেছিলেন সেই ভাষার কবি হিসেবে।

শিল্প সম্বন্ধে মানুষের স্পর্শকাতরতা সুবিদিত; ভগবান যে কোন নির্দেশই দিন না কেন, প্রজ্ঞা যা কিছু প্রমাণেরই প্রয়াস করুক না কেন, ভগবান এবং মানুষের প্রজ্ঞা এরা উভয়েই শিল্পকে আপন আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন। তাই Republic গ্রন্থে শিল্পকে সত্যের অপলাপ চিত্রণের মাধুর্যময় মাধ্যমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সে অমৃতভাবণে মানসিক ব্যাধির

নিরাময় হয়। শিশুরা এবং শিশুধর্মী বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও অনেকেই বুদ্ধির আবেদনে সাড়া দেয় না; চিত্রকল্পের আবেদনে এরা সাড়া দেয়। দুহাজার বছর পরে ঋষি টলস্টয় বললেন যে শিল্প-কর্মের মহৎ উদ্দেশ্য ও গুরু দায়িত্ব হল মানুষকে আপনার মনুষ্যত্বের জ্ঞানটুকু দান করা। মানুষ যে ঈশ্বরের পুত্র সেই সত্যটুকু সম্বন্ধে অবহিত করা। শিল্প আপনার প্রসাদগুণে ও সর্বজন-বোধ্যতায় নীতিশিক্ষার বাহনরূপে গণ্য হতে পারে। যে ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা ও নৈতিক নির্দেশবাণী ফলপ্রসূ হয় না, সেক্ষেত্রে শিল্প প্রায়শঃই কার্যকরী হয়।

এ সত্যটুকু দার্শনিকদের কাছে সম্প্রতি গ্রাহ্য হয়েছে যে শিল্পের মাধ্যমে যে শুধুমাত্র নৈতিক সত্য অথবা নীতিসারটুকু পরিবেশিত হয় তা নয়, শিল্প-চর্চায় ও শিল্পানন্দ আস্বাদনের ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে আমরা নীতি-দর্শনের দৃষ্টান্ত অথবা শব্দ-ব্যতিক্রমরূপে গ্রহণ করতে পারি। মন যে সত্য সপ্রমাণ করতে চায়, চিত্রকল্প তাকে ফুটিয়ে তোলে। নীতিবাগীশেরা শৃঙ্খলা, একতা ও পারম্পর্যকে নৈতিক জীবনের আবশ্যিক উপাদানরূপে গণ্য করেন; তাদের মতে মানুষকে উপায়রূপে গণ্য না করে উপেয়রূপে গণ্য করা উচিত। তাঁরা আমাদের শেখালেন যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে লঘু ব্যাপারের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে, যা অকারণ অনিমিত্তিক তাকে গ্রাহ্য না করে যা সারবান তাকেই গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা সমন্বয়ের জন্য শৃঙ্খলা দাবী করেছেন, স্থিতির জন্য কেন্দ্রীকরণ চেয়েছেন এবং শান্তির জন্য জটিলতা পরিহার করেছেন। এই ধরনের নৈতিক জীবনের উপাদানের মধ্যে ও শিল্প-উপাদানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শিল্পের গুণ তার সৌরভ, তার স্বাদ, তার অসামান্যতা—এ সবই হল শিল্প-উপাদানগুলির বিশেষ রীতিতে সমস্যা সমাধানের ফলমাত্র। সিজানের আঁকা ঐ ছবিটি অথবা বীটোফেনের এই কোয়ার্টেটটি যে অসামান্যতার দাবী করে তা তাদের আপন আপন উপাদান এবং উপকরণগুলিকে সমন্বিত করার বিশেষ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ঐ ছবিটির কোন একটি উপাদান যদি ভিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হত তা হলে ছবিটির প্রকৃতি ভিন্ন হত; কোয়ার্টেটের বিষয়বস্তুর রূপান্তর ঘটালে কোয়ার্টেটটিও ভিন্ন হত। শিল্পের সমগ্রতার মধ্যে সমন্বিতরূপেরই প্রতিষ্ঠা; এই সমন্বয়, এই ঐক্যের অসদ্ভাব ঘটলে তা ছবিই বলুন আর সঙ্গীতই বলুন, উভয়েরই

চরিত্রহানি ঘটায়। শিল্পকর্মের মধ্যে যে সুষ্ঠু শৃঙ্খলাটুকু শিল্পী বহু আয়াসে রচনা করেন, তা থেকে যদি কখনো বিচ্যুতি ঘটে তবে পারম্পর্য লুপ্ত হবে, ঐক্য বিনষ্ট হবে এবং সৃষ্টিশীল শিল্প মাধুর্যের যে অনন্ততা শিল্প-কর্মের কোথাও তার চিহ্নমাত্র থাকবে না। বারবার ভুল করেও সেই ভুলের নিবারণ প্রয়াসের মাধ্যমে শিল্পী তার শিল্প-রীতিকে আয়ত্ত করেন; তাঁর সহজাত নৈতিক প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কেবলমাত্র অলংকরণকর্মটুকুর পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি হিংসাকে পরিত্যাগ করেন যখন হিংসা শক্তির বিকৃত মূর্তি পরিগ্রহ করে। তাঁর বক্তব্যে বাহুল্য বর্জিত হয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির উপাদানকে, তাঁর রীতি ও আঙ্গিককে এবং তাঁর আপন শিল্পীসত্তাটুকুকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করেন। এ এক পরম বিস্ময়ের কথা।

পোলোনিয়স বলেছিলেন যে নিজের কাছে মিথ্যাচরণ করো না। অনেক সময় শিল্পীরা তাঁদের সুদীর্ঘ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে আপনার শিল্পসত্তাটুকুর পরিচয় পান; শিল্পের যে শৃঙ্খলা তারই মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটে। শিল্পী আপন শিল্পকর্মের মধ্যে যে কঠোর শৃঙ্খলাটুকুর সৃষ্টি করে তা বহিরাগত কোন সন্ন্যাসধর্মের কর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। শিল্পী আপনার সৃষ্টির অনুকূলে যেভাবে নিজ মানস-প্রবণতা ও আঙ্গিককে কেন্দ্রীভূত করে তাকে কোন ভাবেই কোন নৈতিক আদর্শ খর্ব করতে পারে না। আমরা শিল্পকলার মধ্যে উপায়কে উপেয়ের মর্যাদা দেবার যে প্রবণতাটুকু দেখি তা কোন নৈতিক তত্ত্ব অথবা নীতি-আচরণের মধ্যে খুঁজে পাই না। সিজানের ভাষায় যে শিল্পকে 'পূর্ণ শিল্প' বলা হয়েছে সেই ধরনের শিল্পকর্মে কোন কিছুই কেবলমাত্র উপায়রূপে গণ্য হয় না। শিল্পের সকল উপাদানই সামগ্রিক শিল্পসত্তার অঙ্গস্বরূপ। শিল্প-অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য যদি শিল্পকর্মকে অনুপ্রাণিত করে তবে তা যেমন শিল্পীর নিজের কাছে ধরা পড়ে, তেমনি আবার তা বোদ্ধা দর্শকের দৃষ্টিও এড়ায় না। প্রতারণা, পেশাদারী কৌশল, নাটকীয় আঙ্গিক, আবেগ-উদ্বেলতা, চটকদারি অভিনবত্ব—এসব দিকে নিম্নশ্রেণীর শিল্পী দৃষ্টি দেন, তাঁর জাগতিক সাফল্য হয়ত সহজে আয়ত্তে আসে। কিন্তু এই পথে কোন শাশ্বত শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

শিল্পের জগতে উপায় এবং উপেয়কে, উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টিকে, বক্তব্য এবং বলার ভঙ্গীকে পৃথক করা যায় না। আমরা এ কথা বলছি না যে

শিল্পী অন্যান্য মানুষের মত সুযোগ-সন্ধানী নন; তিনি ভণ্ড অথবা নির্বোধের মতও ব্যবহারও করতে পারেন তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি যেখানে সার্থক শিল্পস্রষ্টা, সেখানে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য, তাঁর সত্যানুরাগ, শিল্প-উপাদান এবং আঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়-সাধনে তাঁর নিবিড় আগ্রহ, তাঁর বক্তব্য এবং বক্তব্য-নিবেদনের ভঙ্গী বিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা—এসবের অপ্রতুলতা কখনই ঘটে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নির্লিপ্ত দর্শন-আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা যে সমগ্রতা ও সমন্বয়ের নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই, তার দেখা পাওয়া যায় সার্থক শিল্পীর শিড়-এষণায়।

যে কাল সমাগত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যা একান্তরূপে সত্য তার অন্তরেও যে কল্যাণ অনুস্যূত রয়েছে, এ ধারণা নৈতিক-আদর্শ-উৎসারিত। যা ঘটেছে তারই স্মারকচিহ্ন হল শিল্পকর্ম। শিল্প-সমারোহ বর্তমান কালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যে কোন আদর্শ জীবনের কথাই আমরা কল্পনা করি না কেন, সেই জীবনটুকুকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একদিন না একদিন সত্য করে তুলতে হবে। দূর ভবিষ্যৎ কোন না কোন সময়ে বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করবেই। যে পরম শান্তি আমাদের কাম্য তাকেও আমরা বর্তমানের পটভূমিতে পেতে চাই। স্বর্গ, আদর্শ ভাবরাজ্য এসবই হল জীবনের ভাবী পরিণতিমাত্র; জীবন যা হবে, যা হতে পারে তারই কল্পিত রূপ। স্বর্গরাজ্যের প্রশস্ত অঙ্গনে, ভাবরাজ্যের সীমান্তে সেই সব আদর্শ, সেই সব মূল্যবোধ, সেই সব মহৎ গুণ আত্মগোপন করে থাকে, যা আজও আমরা আমাদের জীবনে এবং কর্মে সত্য করে তুলতে পারি নি। নৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে আমরা নীতি-আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করার আঙ্গিক-টুকুকে প্রত্যক্ষ করেছি, মূল্যবোধকে দৈনন্দিন জীবনে প্রকট হতে দেখেছি। যে নৈতিক তত্ত্বে ভবিষ্যৎ কালের পরিপ্রেক্ষিতে কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেই, তা যদি অশুভকে দূরীকরণের পথ নির্দেশও করে তবে তা প্রতারণার নামান্তর মাত্র হবে। কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মোৎসর্গ ও কঠোর শৃঙ্খলার প্রবর্তনা যদি কেবলমাত্র আত্মদমন ও আত্মদানের জন্যই করা হয় তবে তাকে আত্ম-নিপীড়ন ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলবে না। কল্যাণকে, শুভকে আমরা 'সুখ' বা 'স্বর্গীয় শান্তি' প্রমুখ আখ্যায় ভূষিত করতে পারি; কিন্তু যখন আমরা এই সুখটুকু ভোগ করি, এই স্বর্গীয় শান্তিতে অবগাহন করে উঠি

তখন তা আর ভবিষ্যতের অঙ্গীকারটুকুমাত্র নয়, তা হল বর্তমান কালের উপজীব্য আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়; তা হল একান্তরূপে বাস্তব।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে শিল্পের রূপে ও রেখায় তার আত্যন্তিক লক্ষ্যটুকু আপনাকে প্রকাশ করে; কল্পিত মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে শিল্প-কর্ম গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। সেই নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধের সমগোত্রীয় মূল্যবোধ আবার নীতিতত্ত্বেরও উপজীব্য। নীতিশাস্ত্রের উপজীব্য যে শুভাশুভের ধারণা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদেরই আমরা প্রত্যক্ষ করি শিল্পের জগতে। নীতিশাস্ত্র যেসব শুভ এবং কল্যাণেব কথা আমাদের শুনিয়েছে তারা সকলেই প্রায় কোন না কোন শিল্পকর্মেব মধ্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কী সেই দার্শনিক স্পিনোজা কথিত আমাদের বৃহত্তর সত্তার বোধ, আপনার কল্যাণবোধ যার সাহায্যে স্পিনোজা মনুষ্য-কর্মের বিচার করেছেন? সঙ্গীতে এবং বিয়োগান্ত নাটকে আমাদের যে দ্রুত ধাবমান বহুমুখী অভিজ্ঞতার আস্বাদন ঘটে তার জুড়ি অন্য কোথাও মেলা ভার। সৃজনে ও সৃষ্ট-কর্মের রসাস্বাদনে এ তত্ত্ব সমানভাবে সত্য। দার্শনিক নীটসে, শিল্পের এই গুণ ও চারিত্রধর্ম অবলোকন করেছিলেন। তিনি একে 'ডায়োনিজীয়' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। শিল্পের যে আত্যন্তিক শক্তিটুকুর আমরা সন্ধান পাই তা শুধুমাত্র বিচার বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না। আকারগত সংস্থাপনার মাধ্যমেও এই শক্তিটুকুর সন্ধান করা যায় না। শিল্পকর্মের এই শক্তি, এই প্রাণ দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে যায়। শিল্পী সৃজনকালে এই শক্তিটুকু আস্বাদন করেন। শিল্পী তাঁর শ্রোতা অথবা দর্শকের অন্তরে এই শক্তির সঞ্চার করে দেন। শিল্পীর এই কাজটুকু হল যথার্থ শিল্পীজনোচিত। যদি নীতিশাস্ত্রের কাজ হয় জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জীবনে শক্তির সঞ্চার করা যার ফলে জীবন সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আমরা বলব যে ঠিক এই কাজটুকুই শিল্পও সম্পন্ন করে। মানব-অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে, প্রশস্তও করে এই চারুশিল্প।

নৈতিক চিন্তা আদিকাল থেকে জীবনকে প্রশস্ত, পর্যাপ্ত করতে চেয়েছিল। আর এই পর্যাপ্তিটুকু আমরা দেখেছি শিল্পের শব্দ, রঙ এবং কথার উদার দাক্ষিণ্যে। জীবনে এই উদারতা, এই প্রাচুর্য, এই দাক্ষিণ্যের একান্ত

অভাব। শিল্পে ইন্দ্রিয়জ উপাদানের প্রাচুর্য, তীক্ষ্ণ তীব্র আবেগের গভীরতা আমাদের এই সত্যটুকু সম্বন্ধে অবহিত করে যে বুদ্ধি ও কৌশলের যথাযথ ব্যবহার করলে জীবনও শিল্পপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারত; অবশ্য যদি ব্যক্তি-জীবনকে এবং সমাজকে আমরা একটি সামগ্রিক শিল্পের বিষয়বস্তু করে তুলতে পারি তবেই এটি সম্ভব হত। শিল্পে যে রূপ, যে রঙ, যে প্রাণটুকু প্রত্যক্ষ করি তা শুধুমাত্র শিল্পের জগতেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে কেন? অবশিষ্ট জীবনটা শুধুমাত্র ছকে বাঁধা, প্রাণহীন, বর্ণ-বৈচিত্র্যহীনই বা হবে কেন? একটা শ্রেণীগত ঐতিহ্যের বশবর্তী হয়ে আমরা বিশ্বাস করি যে বস্তু ব্যবহারিক এবং সুন্দর এই উভযশ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। যাঁরা লাভ করার জন্য ব্যবসা করেন তাঁরা এই বিভাগে বিশ্বাস করবেন। কারুকলার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ব্যবহারগত প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয় এমন জিনিষে সুন্দরের স্পর্শটুকু এসে লাগতে পারে; যে সমাজে সকলকে উপেয় হিসাবে গণ্য করা হয় সেখানে সকলেই এমন কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে যে কাজ শিল্প-প্রাণনায় অনুপ্রাণিত। যে সমাজে যুথবদ্ধতার প্রকোপে মানুষের সকল প্রযাসই প্রাণহীন এবং মৃত সেই সমাজের মানুষের শিল্পকর্মেই কেবলমাত্র আমরা এই প্রাণশক্তির প্রাবল্যটুকু প্রত্যক্ষ করি।

নীতিবাগীশের দল নীটশের কথিত এই ডায়োনিজীয় গুণটি সম্বন্ধে বড়ই সংশয়যুক্ত, তা সে শিল্পেই হোক আর জীবনেই হোক না কেন। দুর্বার প্রাণশক্তি সমাজে বন্য বর্বরতার সূচনা করতে পারে, আবার ব্যক্তিগত জীবনে তা মূর্চ্ছারোগেরও সূত্রপাত করে। এরা উভয়েই পরম ক্ষতিকর। মানুষ মধ্যাহ্নবেলার কলরবমত্ত কীটপতঙ্গমাত্র নয। জীবনে সাধনার প্রয়োজন এবং এই জীবনকে বিচার করতে হবে ভবিষ্যৎ-কালের পটভূমিতে। ভালোভাবে বাঁচতে হলে ন্যূনতম সমন্বযটুকু সাধন করতে হবে। বিশৃঙ্খলার বিকল্প হচ্ছে শৃঙ্খলা। সৎ-জীবনে নিয়ন্ত্রণের দরকার। জীবনের উদ্যানে পরিশ্রম করতে হয়, তবেই না বর্ণোজ্জ্বল পুষ্প সমারোহে দশদিক আকীর্ণ হয়ে উঠবে। অন্যথায় আগাছায় চতুর্দিকে ভরে যাবে। হয়ত দৈবাৎ এখানে ওখানে দু'একটি 'বাহারে ফুল ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলবে। এই ক্ষেত্রেও শিল্প হল দৃষ্টান্ত-আশ্রয়ী নীতি-শিক্ষক। দার্শনিক নীটশে শুধুমাত্র শিল্পের

ডায়োনিজীয় গুণটির কথাই বলেন নি। তিনি শিল্পের এ্যাপোলোনীয় গুণটির কথাও বলেছেন। শিল্পে যেমন প্রাণবন্যার উদ্দামতা আছে তেমনি আবার তা স্থৈর্য ও শান্তির প্রতীক। শিল্পে আমরা যে পরিমাণে এদের দেখা পাই ঠিক সেই পরিমাণে জীবনে এদের দেখা পাই না।

উনবিংশ শতকের শেষপাদে শিল্পের পলায়নী প্রবৃত্তিটুকু নিয়ে যে বাদানুবাদ চলেছিল তা আজও অব্যাহত আছে। ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে একদল পণ্ডিত এই গজদন্তমিনারকে সমর্থন করেছেন আবার অন্য আর একদল এর বিরোধিতাও করেছেন। যদি শিল্পকে 'পলায়ন' আখ্যাই দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই তার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। মানুষের মনের আভ্যন্তরীণ জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিই হল এই শিল্পকর্ম; স্নায়বিক বিকারের বেদনার শান্তিও এই শিল্পকর্মে পাওয়া যায়। বিশৃঙ্খল সমাজের ব্যাপক বিকারের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে শিল্পের জগতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়; জাগতিক নৈরাজ্য, মানসিক জটিলতা—এদের হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় শিল্পের সৌন্দর্যলোকে। চিত্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থানিক সংস্থানে, তার বিস্তারে ও গুরুত্বে, সঙ্গীতের শব্দ শোভাযাত্রার সুস্পষ্টতায়, কাব্যের ছন্দোময় আনন্দের মধ্যে আমরা শৃঙ্খলাকে পাই, সমন্বয়কে প্রত্যক্ষ করি, শান্ত রসের আস্বাদন করি। নীতিবাগীশের দল সমন্বয়ের মধ্যে যে মূল্যটুকুকে প্রত্যক্ষ করেন তা শিল্পের সীমিত প্রাকারের মধ্যে সহজলভ্য। শিল্পের এই সমন্বয়ধর্মী রূপটুকু শুধুমাত্র সান্ত্বনাই দেয় না অথবা পলায়নের সুযোগটুকুই দেয় না, আগামী দিনের সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটুকু তারা আমাদের সামনে তুলে ধরে। তারা হল অনাগত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। আত্মনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাটুকু শিল্পকর্মের উপাদান এবং আঙ্গিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়, এই শিল্প-শৃঙ্খলা সেই বৃহত্তর জীবন-শৃঙ্খলাকে দ্যোতিত করে, এই বৃহত্তর জীবনশৃঙ্খলার প্রসাদে আমরা বন্য-বর্বরতার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করি, স্নায়বিক বিকার থেকে ব্যক্তিমানসকে রক্ষা করি; অন্যদিকে এই শৃঙ্খলাই একনায়কতন্ত্রের লৌহনিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। শিল্পে মানুষ তার পরিমিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ফিরে পায়, জীবনে এইটুকুরই অভাব। সমাজে—তা সে গণতান্ত্রিকই হোক অথবা একনায়ক-তান্ত্রিকই হোক, সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিল্পী এবং নীতিবিদেরা স্থান পরিবর্তন করেছেন। অতীতে নীতিবিদ শিল্পীকে উপদেশ দিয়েছেন ; এখন আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে শিল্প থেকে নীতিবিদেরা কিছু কিছু নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা, নীতিবিদ জীবনের মূল্য সম্বন্ধে, সংগতি, প্রাণ এবং উজ্জ্বল, ঐশ্বর্যবান, তীব্র, তীক্ষ্ণ, জীবনায়ন সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বকথা বলেন তার সবটাই শিল্পপ্রতিভা আপন সৃষ্টিতে প্রমূর্ত করে দিয়েছেন ব্যবহারে এবং বোদ্ধা রসিকের দল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্ভার জীবনচর্যার উপাদান এবং উপকরণগুলিকে প্রত্যক্ষও করেছেন। জীবন যখন আপনাকে উপলব্ধি করে—তখন তার সম্ভাব্য যে রূপ, সেই রূপই শিল্পে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। শিল্পের অতি প্রত্যক্ষ এই রূপ দর্শককে এবং শ্রোতাকে নতুন নতুন জীবনচর্যায় অনায়াসে উদ্বুদ্ধ করে ; তর্ক করে অথবা আদেশ দিয়ে মানুষকে বশ করা যায় না। শিল্প আপন ঐশ্বর্যময় রূপটুকু দেখায় আর সেই রূপে বোদ্ধা রসিকজন মুগ্ধ হয়। তাঁরা শিল্পকে ভালবাসেন।

এইভাবে শিল্পকর্মের মাধ্যমে আমরা যে সব মূল্যকে ইন্দ্রিয়গোচর করে তুলি, তারা আমাদের কল্পনার উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। প্লেতো থেকে টলস্টয় পর্যন্ত সকল দার্শনিকেরাই এ বিষয়ে একমত যে শিল্পের ভাষা হল সর্বজনীন ভাষা ; সূত্রের ভাষা, আদেশ-নির্দেশের ভাষা—এদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান, অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভাষা হল শিল্পের ভাষা। ধর্মে আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা শুনেছি ; যাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সামাজিক তাঁরা সমবায় প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। শিল্পে অবশ্য এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব এবং সমবায় প্রচেষ্টা এতদুভয়কেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানুষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান যে আবেগগত জীবন তার গভীরে শৃঙ্খলাটুকু রয়েছে। সেইটুকু শিল্পীর শিল্পকর্মে সুপ্রকট, প্রবৃত্তির উন্মাদনা অনুভূতির বিমল আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কবিতার ভাষায় সব শিল্পই কথা বলে। সেই কথায় যেন ছবি আঁকা হয়। সে ছবির ভাষায় সানুনয় আবেদন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। মানুষের নৈতিক জীবনের নিয়ন্তা হিসেবে এই সব শিল্পকর্মের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। স্বৈরাচারী একনায়কেরা সঙ্গীতের, চিত্রের এবং কথার অন্তর্নিহিত শক্তির কথাটুকু জানেন। বাস্তববাদী নীতিবিদেরও এই শক্তিটুকু সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

দর্শনের নৈতিক দিক সম্বন্ধে এবং শিল্পের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধের প্রসঙ্গে আমাদের আর একটু বক্তব্য আছে। মানুষেরা যে সব বিশ্বাস এবং আদর্শকে আশ্রয় করে জীবন যাপন করে, নীতিবিদেরা সেগুলি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। এই আদর্শ এবং বিশ্বাসগুলি যেন শিল্পীর শিল্পকর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের কল্পনায় শিল্পীর প্রতিভার প্রসাদে এরা জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়। এদের এই সজীব অতিপ্রত্যক্ষ রূপটুকুর নৈতিক প্রভাব দূরপ্রসারী। এরা মানুষের নীতিজ্ঞানকে সক্রিয় করে। ন্যায়-বুদ্ধির কাছে যা সুপারিশ করে, .যে আদর্শের কথা বলে শিল্পে সেই আদর্শের মনোহরণ মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। শিল্পকলার জগতে আমাদের অনুভূত মূল্যটুকুর সঙ্গে সর্বজনস্বীকৃত মূল্যবোধের কোন প্রভেদ থাকে না।

দার্শনিকেরা চারুকলার নৈতিক দিক সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেন তা অনিচ্ছাপ্রসূত। ওঁরা বলেন যে শিল্পকর্ম মানুষের আনন্দের উৎস। দার্শনিকেরা হয় এই আনন্দকে অস্বীকার করে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন অথবা এই নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। মানুষের সামগ্রিক ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে শিল্পের স্থান নির্ণয় করার চেষ্টাও এঁরা করেছেন। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে দার্শনিকদের যে আগ্রহ দেখা যায় তার বোধ হয় সূক্ষ্মতর কারণ রয়েছে। শিল্পের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, আবেগ উদ্রিক্ত করে, তার মধ্যে আমরা দর্শনের বিশেষ করে অতীন্দ্রিয় ভাববাদী দর্শনের সমস্যা এবং তার সমাধানের ইঙ্গিতটুকু প্রত্যক্ষ করি। কবিরা বলেছেন যে সুন্দরই হল সত্য এবং সত্যই হল সুন্দর। দার্শনিকেরা অনেক বিচার বিবেচনা করে অবশ্য অনুরূপ সত্যে উপনীত হয়েছেন।

দার্শনিকেরা সত্যের যেসব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করা স্থানাভাব-বশতঃ সম্ভবপর হচ্ছে না। সত্যের যে ক্রিয়াশীলতা প্রমেয়, ইন্দ্রিয়-অগোচর বস্তুসত্তার সঙ্গে যার অবিরোধ তাকেই দার্শনিকেরা 'সত্য' আখ্যায় ভূষিত করেছেন; ঘটনার বোধগম্য সার্বিক বর্ণনাকেও অনেকে সত্য বলেছেন। কিন্তু যে ঘটনাটি সত্যকে প্রমাণ করে, সত্য এবং যে ঘটনা পরস্পর অবিরোধী, সত্য যে ঘটনাটি বর্ণনা করে মাত্র, সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। কোন বর্ণনার সাহায্যেই ঘটনাটিকে যথাযথ ব্যাখ্যাত করা যায় না। এটি অনন্যসাধারণ, প্রত্যক্ষগোচর এবং নৈর্ব্যক্তিক।

এটি ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমন্বয় ; কোন সামান্ত বচনের দ্বারা এর বর্ণনা করা যায় না। ওল্ড টেস্টামেণ্টের জিহোবার মতই ঘটনাটি হল একক এবং অনন্ত। যে বর্ণনা, যে আলোচনা, ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করে, নিশ্চয়ই তা ঘটনাটির অস্তিত্বের সমার্থক নয়। জাতিবাচক বিশেষ পদগুলি সাধারণ পদ মাত্র। বিজ্ঞানের ভাষা, এমন কী ব্যবহারিক বুদ্ধির ভাষাও বহুল পরিমাণে নির্বিশেষ এবং সাধারণ ; এই ভাষায় সবার মধ্যে পাওয়া যায় এমন ন্যূনতম সাধারণ গুণের অস্তিত্বের কথা, শ্রেণীর কথা, পুনরাবির্ভাবের কথা, শ্রেণীর গড়ের বর্ণনা এ সবই পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা আপন অব্যবহিতত্বে অনন্ত, আপন স্বাতন্ত্র্যে অনির্বচনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে আমরা ঘটনার স্বাতন্ত্র্যটুকু বোঝাতে পারি না। শুধুমাত্র তার সম্ভাব্য অনুষ্ঠানটুকু নির্দেশ করতে পারি। প্রত্যেকটি শিল্পের নিজস্ব ভাষা আছে ; শিল্পী এই ভাষার মাধ্যমে তাঁর জীবনের স্বাদটুকু, তাঁর চোখে দেখা বিশ্বভুবনের ছবিখানি, তাঁর অভিজ্ঞতার স্বর্ণোজ্জ্বল আবেগবিহ্বলতাটুকু পরিবেশন করেন। সেই পরিবেশনায় শিল্পী তাঁর শিল্প-আঙ্গিক ও নৈতিক বোধটুকুর সমন্বয় ঘটিয়ে যে প্রতিমা সৃষ্টি করেন, যে শব্দ-সম্পদের ঐশ্বর্য বিকাশ করেন, যে কথা, যে রেখার বিন্যাস করেন, তা অনবদ্য।

শিল্পের জগতে যে সত্যের কথা বলছি তা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। বস্তুর যে বাহ্য সত্যটুকু অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন তাকে আমরা সত্য বলে স্বীকার করি না। ঘটনা এবং ঘটনাসন্নিবেশকে এবং আমাদের আবেগগত জীবনকে আশ্রয় করে যে বাহ্য সত্য রয়েছে তাও স্বীকার্য নয়। জলের উপাদান সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সূত্রটুকু আমরা জানি তার দ্বারা জলের আস্বাদ পাই না, জলের ওপরকার ঝিকিমিকিটুকু দেখি না। জ্যোতির্বিদ যখন বলেন যে চন্দ্র হল দু'শ তিরিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত একটি মৃত তারকামাত্র তখন তাঁর উক্তির সত্যতা কবি-কথার সত্যতাকে ব্যাহত করে না ; কবি বলেন, চন্দ্র হল আঁধার রাতের রাণী। Wagner's Tristan-এ প্রেমের যে ছবি আমরা অঙ্কিত দেখেছি তার সঙ্গে প্রেমের শরীর-স্থান-বিদ্যার কোন মিলই খুঁজে পাই না। সত্যের নানান রূপভেদ ; তা নৈতিক, কাব্যিক অথবা নাটকীয় হতে পারে। কোন একটি ঘটনা আমার কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়, তার মধ্যেই তার সত্যটুকু নিহিত থাকে। ব্যক্তি-

নিরপেক্ষ উদাসীনতার মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে না। মানুষের আবেগ ও কল্পনার উপর সত্যের যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তা হল শিল্প-সত্যের সামগ্রিক রূপের অঙ্গস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গোচর যে রূপ, আবেগের যে রঙ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তার সবটুকু শিল্পী শিল্প-সত্যরূপে পরিবেশন করেন।

শিল্পের কথায় মানুষের ইন্দ্রিয় ও হৃদয় সায় দিলেও দার্শনিক শিল্পের এই ভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেন না, শিল্পের ভাষা প্রমাণযোগ্য নয়। যেমন বিজ্ঞানের সূত্রগুলি পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় তেমনিধারা শিল্প-সত্য প্রমাণযোগ্য নয়। ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত পথে শিল্প-সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই বৈজ্ঞানিক সত্য অথবা তর্কশাস্ত্রসম্মত সত্যের সঙ্গে তুলনা করলে শিল্পসত্যকে, শিল্পের নৈতিক এবং কাব্যিক সত্যকে বড়ই অনির্দিষ্ট এবং অর্থহীন বলে মনে হয়। তবুও এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা সাধারণ নরনারীর সঙ্গে একমত যে শিল্পের সত্য হল বিশেষ-আশ্রিত সর্বাশ্রয়ী সত্য; তর্কশাস্ত্রের অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের থেকে এ সত্য অনেক বেশী গ্রাহ্য কেন না শিল্পসত্যে আমাদের অভিজ্ঞতার সদর্থ টুকু অনুস্যূত হয়ে যায়। শিল্পের বিন্যাস-প্রকরণ প্রকৃতির বিন্যাস-প্রকরণ থেকে স্বতন্ত্র; আমরা যা দেখি, শুনি এবং অনুভব করি তার ভাষা রচনাকালে যে ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়, সেইটুকুই হল শিল্পের অবদান। শিল্পের ভাষার সুস্পষ্টতায় আমরা বস্তু-সত্যটুকুকে অবলোকন করি; বস্তু-সম্বন্ধীয় সত্যটুকু শিল্পলোকে এহ বাহ্য।

দর্শন এবং বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোচনা বস্তুর অন্তর স্পর্শ করলেও শিল্পের ভাষা যে গভীরে পৌছোয় তারা সেখানে পৌছোয় না; অভিজ্ঞতার কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পের ভাষা ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ নেই; শিল্প ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তার প্রকাশ সম্ভব নয়। এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে ভাষান্তরিত করা সম্ভব নয়; এক শিল্পের আঙ্গিক অন্য শিল্পে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। শিল্পের ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় বা ব্যবহারিক জীবনের ভাষায় রূপান্তর গ্রহণ করে না। অস্পষ্ট গূঢ়ার্থবাদীদের মত শিল্পীরাও যে ভাষা বলেন তা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি আবার তা অপ্রমাণও করা যায় না। শিল্প তার অভিনব প্রকাশে আত্মার দর্শনের জন্য আর একটি বাতায়ন খুলে দেয়, তার মধ্য দিয়ে আর একটি বিশ্বভুবনের দর্শন মেলে। সম্মোহিত

দর্শক তৎকালের জন্য ঐ ভুবনটিকেই সত্য জ্ঞান করেন। শিল্প ব্যতীত অন্য কোন কিছুর আনুকূল্যে সেই জগতে প্রবেশ লাভ করা যায় না।

যেসব মানুষের সঙ্গে আমরা নিত্য নিয়মিত বাস করছি তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অন্ধ এবং অজ্ঞ থাকি। ভিন্নধর্মী চরিত্র-বহুল একটি উপন্যাস পড়ে আমরা এমন কতগুলি চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে পারি যাদের দেখা আমরা হয়ত দৈনন্দিন জীবনে পেয়েছি। অথচ উপন্যাসটি পাঠ করে পরিচিত সেইসব মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি তা তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ব্যবহারেও পাওয়া সম্ভব নয়। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হলেও এই অন্তর্দৃষ্টিটুকু পাওয়া যায় না। শিল্পীর আঁকা গাছের ছবি দেখে বা নিসর্গ চিত্র দেখে যে সত্য উপলব্ধি করি তা হয়ত পূর্বে উপলব্ধি করিনি—গাছটি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যটী দেখার পরও। আঙ্গিক মাধ্যমে তাঁর শিল্পদৃষ্টির যে পরিচয় পাই তা অনন্যসাধারণ। শিল্পীর দৃষ্টি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে, তাই তিনি যা দেখেন, যা দেখান তা সহজলভ্য নয়। আমরা বস্তুর যে রূপটী শিল্পমাধ্যমে দেখি তা বস্তুর সত্তাটাকে উদ্ঘাটিত করে ; যদি শিল্পীর দৃষ্টি দূর-বিস্তৃত হয় এবং তার আঙ্গিক পরিণতি লাভ করে থাকে তা হলে সহজই তিনি ভগবানের রূপটুকু, আপন চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কোন দার্শনিক কোন ভগবদ্‌তত্ত্ববাদী ঈশ্বরের সেই রূপটুকু, সেই সত্তাটুকুর বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সর্বোপরি যে ঘটনাটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার অনন্যসাধারণতা শিল্পের ভাষায় যেভাবে ফুটে ওঠে এমনটি আর অন্য কোন ভাষায় হয় না। এই অন্য ভাষায় শিল্পের প্রকাশভঙ্গীটুকু অনায়ত্ত। বিজ্ঞান অথবা সহজ ব্যবহারের ভাষায় তার সন্ধান মেলে না। তারা নিয়ন্ত্রণের শৈলী নিয়েই ব্যস্ত থাকে ; বস্তুর আত্যন্তিক ধর্মটুকু সম্বন্ধে তারা উদাসীন। শিল্পের ভাষা হল উপলব্ধির ভাষা, এই ভাষায় বস্তুর সত্তাটুকু সহজেই উদ্ঘাটিত হয়। দার্শনিক যে ভাষায় কথা বলেন তার দ্বারা এই উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। শিল্পীর প্রতিভাই এই সত্তাটুকুর স্বরূপ ব্যাখ্যানে সক্ষম। সাধারণ বুদ্ধির দৌলতে, অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে আমরা যে বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তা থেকে শিল্প আমাদের মুক্তি দেয়। আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করি তার অসাধারণত্ব আমাদের চোখেই পড়ে না কেন না সাধারণ বুদ্ধিতে এটা ধরা পড়ে না

বস্তুর ব্যবহারিক দিকটা ব্যবহারগত জীবনের কল্যাণে ক্রমে ক্রমে বস্তু থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই ব্যবহারিক দিকটির অন্তর্লীন তত্ত্বাবলীকে সুসম্বদ্ধ করে উপস্থাপিত করা হয়। শিল্প সমগ্র বস্তু-সত্তাটিকে মেলে ধরে, তা তত্ত্ব বা ব্যবহারিক দিকটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না।

আর এক অর্থে বলা যায় যে শিল্প সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। আমাদের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা, গোলাপের সৌগন্ধ, বন্ধুর উপস্থিতি, তার কণ্ঠস্বরের ধ্বনিচ্ছন্দ এক অচিন্ত্যনীয় সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়-সংবেদনের দ্বারা আমরা কোন একটি মুহূর্তের দুর্লভ অভিজ্ঞতার সবটুকুকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারি না। সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতার আনন্দের রশ্মিচ্ছটা আমাদের সমগ্র সত্তাকে আলোকিত করে তোলে। সেই আলো, সেই আনন্দ কেবলমাত্র সংবেদন দিয়ে, ইন্দ্রিয়-গোচরতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের আবেগ-বিহ্বলতার সবটুকু দয়িতের কায়িক উপস্থিতি বা সুন্দরের আবির্ভাব পুরোপুরি ব্যাখ্যাত করে না। শিল্পলোকের বাইরে ধর্মের এবং প্রেমের ক্ষেত্রেও আমরা এই আতিশয্য এবং দৈবী-ব্যঞ্জনার সন্ধান পাই। কোন কোন শিল্পকর্মের মধ্যে আমরা এই অদ্ভুত শক্তির সাক্ষাৎ পাই যে শক্তি ব্যবহারিক জগতবহির্ভূত সাধারণ বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাকা এক ধরনের সত্যের সন্ধান দেয়। সেই সত্যটুকু তর্কশাস্ত্র-কথিত বিধিবিধানেরও অলভ্য। ভূগোল বিদ্যা ভূসংস্থানের যে পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বলে তার প্রতিরূপ আমরা শিল্পকর্মে খুঁজে পাই না। এই অতীন্দ্রিয় সত্তাটুকুর ব্যঞ্জনা হয়ত স্বরগ্রামের সামান্য পরিবর্তন করে শিল্পী আপন শিল্প কর্মে সংযোজিত করে দেন। মোজার্টের সোনোটাতে আমরা এর দৃষ্টান্ত পেয়েছি। ভ্যানগগের স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ-সম্ভারে এর ইঙ্গিত আছে, মহাকবি সেক্সপীয়রের নিম্নোদ্ধৃত ছত্রদুটিতে এর নিশানা রয়েছে,

"For God's sake let us sit upon the ground
And tell sad stories of the death of kings."

ব্যবহারিক জীবনের ও বিজ্ঞানের স্থূল আলোচনা শিল্পের সেই উত্তুঙ্গলোকে নিষিদ্ধ; সুন্দরের আমন্ত্রণের হাতছানিতে, বিয়োগান্ত শিল্পের নির্দেশে আমরা সেই পরম রমণীয় শিল্পলোকে প্রবেশ করি। এই দুর্লভ মুহূর্তে শিল্পের ও ধর্মের শক্তি প্রায় অনুরূপ চারিত্র-ধর্ম অর্জন করে; তাদের একাত্ম বললেও মিথ্যা বলা হয় না। এই দুর্লভ মুহূর্তে শিল্পের ও ধর্মের সমাপ্তি ঘটে পরম নীরবতায়

মধ্যে ; প্রেমাস্পদ ও দয়িতের মধ্যে কোন ব্যবধান ও পার্থক্য থাকে না। তারা এক হয়ে যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধরনের সত্যের প্রকাশ সম্ভব হয়। গ্রীসদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান কালক্রমে নাটকে পরিণত হয়েছিল ; গ্রীক নাটকের বিষয়-মাহাত্ম্যে ও চারিত্র ধর্মে তা একেবারেই ধর্মীয় নাটকরূপে গণ্য হয়েছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর আরাধনার সমাবেশ পদ্ধতির মধ্যে নাটকীয়, ধর্মীয়, প্রতীকী, সাঙ্গীতিক এবং চিত্রী উপাদানের আধিক্য অনস্বীকার্য। দার্শনিক প্লেতোর কবিদের সম্বন্ধে খুব অনুকূল মনোভাব না থাকলেও কবিদের কল্পনা এবং সৃষ্টি-শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল ; তাঁদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে বস্তুর যে রূপটি ধরা পড়ে তা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, একথা প্লেতো জানতেন। যাঁরা কাব্যরসিক তাঁদের দৃষ্টিতেও বস্তুর এই অন্তরশায়ী রূপটুকু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইন্দ্রিয়গোচরতার বাইরে বস্তুর এই যে রূপের কথা বলা হচ্ছে এ রূপটুকুর যাথার্থ্য কেমন করে অপ্রমাণ করা যাবে এটাই হল সমস্যা। আর যদি প্রমাণ না মেলে, তবে কেমন করে একে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় ? আর যথার্থ প্রমাণ না করলে একে জ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া চলে না। এর উত্তরে বলা সেই পিয়ানো-বাদকের গল্পই আমরা বলব। বীটোফেনের 'সোনাটা' বাজিয়ে শোনালেন সেই পিয়ানো-বাদক ; তাঁকে প্রশ্ন করা হল এর অর্থ কী ? তিনি তার অর্থের ব্যাখ্যা না করে আর একবার সেটি বাজিয়ে শোনালেন। শিল্প যে গভীরতর সত্যের কথা বলে তা কেবল শিল্পের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই বলা যায়। সাধারণ বুদ্ধির অতীত দৈনন্দিন কথাবার্তার নাগালের বাইরে যে অতীন্দ্রিয় সত্তা রয়েছে তার দেখা পাওয়া যায় শিল্পের চকিত কিরণ-দীপ্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে। সহজে তার দেখা পাওয়া ভার। এই ক্ষণিকের দেখা অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রমাণ মেলে না। যাঁরা শিল্পরসিক ; যাঁদের কানে ঐ সূক্ষ্ম সুরটুকু ধরা পড়ে, শব্দার্থের সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা যাঁদের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে সহজে, তাঁরা বারেবারে ঐ শিল্প-রসের আবেদন করে অতীন্দ্রিয় সত্তাটুকুকে প্রত্যক্ষ করেন আপনার কবি-দৃষ্টির প্রসঙ্গে। এই ভাবে জানা ছাড়া এই সকল জানার অতীত অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানার অন্য পথ নেই। এই সত্তা দুর্জ্ঞেয় ; একে অনির্বচনীয়ও বলা হয়েছে। শিল্পী যখন তাঁর আপন শিল্পের ভাষায় কথা বলেন তখন তাঁকে বোঝা যায়। যাকে

দুর্জ্ঞেয় এবং অসংজ্ঞেয় বলে মনে হয় শিল্প তাকেই প্রমাণ করে; শিল্প অভিজ্ঞতার দিক্‌সীমার বিস্তার ঘটায়, শিল্প যে নতুন ব্যঞ্জনাটুকু সংযোজিত করে দেয় উপাদান পরীক্ষণের সাহায্যে তাকে প্রমাণ করা দুরূহ। শিল্পে এই যে নতুন অর্থ এবং ব্যঞ্জনার সাক্ষাৎ আমরা পাই তা অত্যন্ত অলভ্য। অভিজ্ঞতার অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি তাকে না পাই, যদি সাধারণ বুদ্ধি প্রাকৃতজনের ন্যায় তাকে আবিষ্কার করতে না পারে, তা হলে তাকে অস্বীকার করা চলে না; শিল্পের ভাষার ধরন-ধারণ ভিন্ন; তাই সাধারণ ভাষায় ন্যায়রীতি এক্ষেত্রে অচল। বস্তু-সত্তার সাক্ষাৎ মেলে উপলব্ধির পথে আর এই উপলব্ধি আসে প্রেমের, ভক্তির পথে, শিল্পের ভাষার মাধ্যমে। এই উপলব্ধি আকস্মিকতার দ্বারা চিহ্নিত।

দার্শনিকেরা যখন সত্য এবং জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যাপৃত তখন নন্দনতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় পাওয়া বস্তুর অন্তরশায়ী সত্ত্বাটুকুর কথা ভেবে তাঁরা হয়ত থমকে দাঁড়ান। সম্প্রতি দার্শনিকেরা এই সত্যটুকু স্বীকার করেছেন যে শিল্প-সৃষ্টি এবং শিল্পরসাস্বাদন সমগ্র অভিজ্ঞতাকে এক অভিনব আলোকে আলোকিত করে তোলে। সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে এই ধরনের নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায়। সাম্প্রততম কালে জন ডিউঈ এবং হ্যাভলক এলিসের মত চিন্তাবিদেরা সমগ্র মানব অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপে কল্পনা করেছেন এবং শিল্প বলতে তাঁরা বুঝেছেন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির সাধারণ বিকাশটুকুকে। জীবনকে যদি কালাশ্রয়ী পরীক্ষণ প্রবাহ রূপে গণ্য করা যায় তা হলে বুদ্ধিকে নির্দেশকরূপে গ্রহণ করতে হবে; বৃহত্তর অর্থে শিল্পচর্চা হল বুদ্ধির ব্যবহার মাত্র; সেক্ষেত্রেও আনুষঙ্গিক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সুযোগ এলে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে, উদ্দাম কল্পনার পাখায় ভর করে অজানার পথে ছুটতে হবে আবার স্বপ্নকে বিবেচনার নিগড় দিয়ে বেঁধে স্বস্থ করতে হবে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে আকস্মিক ভাবেই মানুষ জন্ম নিয়েছে। বিজ্ঞানী মানুষ, সাধারণ মানুষ এঁদের মনেও শিল্পীর মতই ভাব, বিষয়বস্তু ও স্বজ্ঞার অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু এই সব ভাবকে যথাযথ অনুধাবন করতে হলে আমাদের বুদ্ধি, শৃঙ্খলাবোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণটুকু একান্তই প্রয়োজন। আমাদের চিন্তার খোরাক, আমাদের ভাব ভাবনা এসবই আমরা প্রকৃতি থেকে আহরণ করি এবং এদের সমন্বয়ের পথেই আমাদের জীবনের

আদর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সফলকাম হয় কেন না শিল্পের জগত আপেক্ষিক সারল্যের দ্বারা চিহ্নিত। জীবনে বুদ্ধির জয় ঘটলে আমরা তাকে শিল্প বলতে পারি। শিল্প যেখানে সার্থক শিল্প হয়েছে সেখানে আমরা বুদ্ধির জয়লাভের উজ্জ্বল নিদর্শন পেয়েছি; অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধিগ্রাহ্য শিল্পের উদাহরণ পাই। শিল্প উপকরণের আদর্শায়িত রূপ-সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পী সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল পথে রসাস্বাদনের সুযোগ দেননি রসিকজনকে। সমাজ, নীতি এবং শিল্প সম্বন্ধে যে ধরনের সমালোচনা করা হয় তার দ্বারা আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন লাভ করে। সমালোচনার মান নির্ণয় করে মানুষের বুদ্ধি। মানুষ আপন অন্তর প্রকৃতি এবং বৃহত্তর-বহিঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে স্ব-উদ্ভাসিত পন্থার যে বিচার বিশ্লেষণ করে তারই নাম হল সমালোচনা। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সমালোচনা জন্ম নেয়; কেন না যখন শিল্প-উপকরণের যথাযথ ব্যবহারে ত্রুটী ঘটে, তাদের বিন্যাসে বিশৃঙ্খলা ঘটে, উপলব্ধির স্বচ্ছতায় ছায়াপাত ঘটে, তখন সমালোচনার সূত্রপাত হয়।

শিল্পবস্তু প্রত্যক্ষ করার সময়ে যদি আমরা শিল্পী মনের প্রয়োগ করি, তখনও শিল্প-সমালোচনার উদ্ভব ঘটে। বৈজ্ঞানিক, সাধারণ মানুষ ও শিল্পীও আপন আপন আঙ্গিকের উপযোগিতাটুকু প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজ নিজ মূল্যমানটুকু প্রয়োগ করেন স্ব স্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে। সমালোচনার অর্থ হল প্রত্যক্ষণকে বুদ্ধির আলোয় ভাস্বর করে অতিনির্দিষ্ট করে দেওয়া। সমালোচনার অর্থ বিধিবদ্ধ করে দেওয়া নয়, সমালোচনাকে অস্পষ্ট উপভোগ বলাও চলে না। সমালোচনার মাধ্যমে মানুষের রুচিবোধ শুদ্ধ, তীব্র ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিল্পই হোক আর জীবনই হোক, উভয়ক্ষেত্রেই সমালোচনা মানব-অভিজ্ঞতাকে আত্মসচেতন, সুনির্দিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে। সমালোচনার পথে কল্পনা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। শিল্পের সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা; শিল্পসমালোচনার এই লক্ষ্যটুকু যথাযথ অনুধাবন করলে আমরা দর্শনের মূল উদ্দেশ্যটুকুও উপলব্ধি করতে পারব। দর্শন হল সমালোচনা কর্মের মূল্যায়ন। মূল্য-বোধের সংজ্ঞাদানের ও বিভিন্ন মূল্যবোধের পৃথকী-করণের যে প্রয়াস সেই কাজটুকু হল দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত।

দর্শন এবং শিল্প এরা পরস্পর মধ্যে অনুস্যূত; এই পারস্পরিক মিলটুকু

দুটি অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ শিল্প এবং দর্শন, উভয়কেই সৃষ্টি ও নির্মাণ কর্ম বলা চলে। চিত্রী যখন ক্যানভাসের ওপর ছবি আঁকেন, তখন তিনি বস্তুতঃ পক্ষে একটি ক্ষুদ্রজগতের সৃষ্টি করেন। রং রেখা প্রমুখ উপায়ের সাহায্যে তিনি তাঁর মানুষচিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলেন; ঘরটি, ঘরের মধ্যে মানুষগুলি, ফুল ও ফলের সমারোহ, এসব মিলিয়ে, সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেন; একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আলো ছায়ার সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি আপন মনের একটি বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়াকে রূপায়িত করে তোলেন। আলো, রেখা, ও রঙ তার শিল্পকর্মের উপাদান। কবি তাঁর কাব্যে অতীতে দেখা শতশত ঘটনার স্মৃতি, অতীতে শোনা রাগ রাগিণীর রেশটুকু যুক্ত করেন; কাব্য অনবদ্য হয়ে ওঠে। গায়ক স্বরগ্রামের অনন্ত সীমাহীন বৈচিত্র্যটুকু আপনার সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন; সোনাটা এবং সিমফনি জন্ম নেয়।

শিল্পের মতই দার্শনিকও সবটুকুকে গ্রহণ করেন না, প্রয়োজন মত বাছাই করে তিনি আপনার জগতটুকু নির্মাণ করেন। মানুষের অভিজ্ঞতার সীমা সংখ্যাহীন ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্যে থেকে তিনি তাঁর প্রয়োজনমত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নির্বাচন করে নেন, এবং এই ঘটনাবলীর শ্রেণীবদ্ধ-করণের মৌন নীতিগুলির মধ্য থেকে কতকগুলি নীতি বাছাই করে নেন। এই নির্বাচিত নীতিগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর দর্শন-সংস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর নীতি-সংস্থা গঠন করেন। জীবন, জগত ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে আপনার চিন্তা থেকে একটি সামগ্রিক দর্শনচিন্তার রূপদান করেন। আমরা মনে করি (এবং শিল্পীরাও তাই মনে করেন) যে শিল্পীরা শিল্প-উপাদান এবং ঘটনাবলীকে নির্বাচন করে ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে এদের সমন্বিত শিল্পরূপটুকু সৃষ্টি করেন, অবশ্য শিল্পীর এই হৃদয়াবেগ বিবেচনার দ্বারা বল্গান্বিত ও পরিশীলিত। দার্শনিকও এই ধরনের কাজই করেন। মানব-চিন্তার ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে আমাদের জগত ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-জনোচিত ধারণাটুকু একটা ছবি অথবা একটি কবিতার মতই নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। যখন এই দার্শনিক ধারণার মধ্যে অঙ্গাঙ্গীযোগ স্থাপিত হয়ে পূর্ণ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন তার থেকে আবার নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। কোন রকম

বদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী না হলে দর্শন আলোচনাকেও একটা মূর্তি, একটি কবিতা অথবা একটি সুরম্য উপাসনাগৃহের মতই সুন্দর বলে মনে হতে পারে। সঙ্গীতের কাঠামোটির মত দর্শনের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুষমাটুকু থাকে না; আবেগ-উদ্দীপনা হয়ত এমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত হয়ে দর্শন আলোচনার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে যে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু বোঝাই যায় না; তাই বলা হয় যে দর্শনচিন্তা হল চিন্তার আবেগ-মুখর রূপ; একে আবেগের উত্তাপরহিত প্রতিমাও বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দার্শনিক স্পিনোজার Amar dei intellectuales-এর কথা বলা যায়। যাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে দর্শনের মর্মকথাটুকু বিচার করতে সক্ষম হন তাঁরা কাব্যপাঠের মতই দর্শনপাঠ করে আবেগের দ্বারা অভিভূত হন; তাঁদের কাছে Charles-এর মন্দির গাত্রের কারুকর্ম দেখা ও একটি দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করা একই কথা। দর্শনগ্রন্থে দার্শনিকের চিন্তা ও অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। তাঁর যুগধর্ম ও তাঁর দর্শন চিন্তায় ছায়াপাত করে।

দর্শনের রূপটুকু আমাদের কাছে এহ বাহ্য কেন না তার গঠন উপাদানে খুব চাকচিক্য থাকে না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়-যে দর্শন-আলোচনা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত, সৌন্দর্যের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু দর্শন-আলোচনারও বিস্ময়কর রূপ এবং গঠনসুষমা থাকে। কাণ্টের Critique of Pure Reason গ্রন্থের রচনা-শৈলীর অনবদ্য সুষমা বহু পাঠকের মনোরঞ্জন করেছে। শিল্পীর শিল্প-রূপের মতই দার্শনিকের লিখনশৈলী তার দর্শনচিন্তাটুকুকে পরিবেশন করার আধার মাত্র। দর্শনের মধ্যে সেই কল্পনার প্রসার, সেই কল্পনার মুক্তিটুকু ঘটে যা শিল্পকর্মের মধ্যে সহজলভ্য। ছবি আঁকার সময়, কবিতা লেখার সময় আমরা পৃথিবীকে যে চোখে দেখি ঠিক সেই ধরনের আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে দর্শনগ্রন্থ লেখার সময় আমরা জগত ও জীবনকে দেখে থাকি। তাই বিভিন্ন দর্শনমতে এতো পার্থক্য। একই জগতকে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। যেমন Brenghel, Cezanne, Watteau এবং Degos এর ছবিতে দেখা জীবন-জগতের রূপ ভিন্ন, যেমন Beethoven Mozart Debussy'র সঙ্গীতে পাওয়া জগতের ও জীবনের আলেখ্য বিভিন্ন, তেমনিধারা বিভিন্ন দার্শনিকের জীবন ও জগত সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাও ভিন্নতর। দর্শন-

চিন্তায় যথার্থ রূপ হল বক্তা-আশ্রয়ী। দর্শন-চিন্তায় অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য অনস্বীকার্য। দার্শনিক যেভাবে পৃথিবীকে দর্শন করেন, তাঁর সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর দর্শন-মতকে রূপ দেয়, তাঁর দার্শনিক মূল্যায়নটুকুকে মর্যাদা দান করে।

পরমবাদী ব্রাডলি থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনবাদী ডিউঈ পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদী প্রায় সকল দার্শনিকই আমাদের বলেছেন যে অভিজ্ঞতা হল অসংজ্ঞেয়, অনির্বচনীয়। অভিজ্ঞতার মূলে রহস্য বাসা বেঁধে আছে। কখন কখন আকস্মিক ভাবে এই রহস্যের অংশবিশেষের উদ্ঘাটন হয়, এটি ঘটে আমাদের অব্যবহিত অন্তর্দৃষ্টির ফলে। মহাকাব্যের মতই দর্শনচিন্তায়ও আমরা এই রহস্যের একটি বৃহৎ অংশের উদ্ঘাটন করি। অতীন্দ্রিয়বাদীরা, দুর্জ্ঞেয়বাদীরা সকল অস্তিত্বের মূলে যে অনির্বচনীয় সত্তা অবস্থান করছে তাকে 'একক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এই একই সহস্ররূপে রূপায়িত হয়েছে। শিল্পীরা এই রহস্যের যথার্থ উদ্ঘাটন করেছেন। রসিকসুজনই যথার্থ অতীন্দ্রিয়বাদী, তিনি সৃষ্টি রহস্যে সেই এককে দেখেছেন, সে দর্শনটুকুতে আবেগবিহ্বলতা রয়েছে, তার তীব্রতাও অনস্বীকার্য। তাঁর চোখে অভিজ্ঞতা সেই মুহূর্তের জন্য সহস্রশিখায় দেদীপ্যমান; শিল্পী যে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন, সেই জগতে একচ্ছত্র শৃঙ্খলার রাজত্ব। সে জগত নিত্য নব-প্রাণনায় অনুপ্রাণিত। প্লোটাইনাসের ভাষায় বলি, শিল্পী সুন্দরের অনুধ্যানে সেই একের সঙ্গে, সেই অনন্ত মহাসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। আর দর্শনের ভাষাতেই হোক অথবা শিল্পের ভাষাতেই হোক মর্ত্যবাসী মানুষ প্রত্যক্ষ করে সেই অনন্তের রূপ, অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করে সেই অনুভূতির সত্যটুকু।